নাগরাকাটায় আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক
সংখ্যা ও তথ্যভিত্তিক কারণ অনুসন্ধান
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা
৭৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ২৭ অক্টোবর, ২০২৫
৯ কার্তিক, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।।
website : www.eswastika.com

DURO
Innovating Since 1957

Duroply Industries Limited

High-performance plywood
since generations, for generations.

- First to manufacture and market plywood made from European Beech
- First to launch one-of-a-kind experience centre in New Delhi
- First to launch 10″ range of plywood in India
- First to introduce lifetime guarantee against insect infestation on premium products
- First to introduce 9X safety under DURO Advantage

Duroply Industries Limited

Head Office: 113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata - 700016
Corporate Office: 1/35, W.H.S., Kirti Nagar, New Delhi - 110015 | **CIN:** L20211WB1957PLCO23493
Toll Free: 1800-345-3876 | **Email:** enquiry@duroply.com | **Website:** www.duroply.in
Find us on: duroplyindia

Scan to know more

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ৯ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৭ অক্টোবর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ভাষাহীন বিপদ আর উদ্ভুত ফসল নির্মাতার কবে পতন? অবৈধ জনপ্রিয়তা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভবানীপুরে ভয় দিদির ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পরম্পরা
◻ বিজয় কুমার ◻ ৮

২০২৬-এর ভোট জয়ের উদ্দেশ্যে জেহাদিদের সবুজ সংকেত দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

উত্তরবঙ্গে লুটের মহাকাব্য—প্রকৃতির কান্না আর রেড রোডের কার্নিভালে তুরুক তুরুক নাচ ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

নাগরাকাটায় আক্রান্ত বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক : সংখ্যা ও তথ্যভিত্তিক কারণ অনুসন্ধান ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ১৩

মন্বন্তর ও ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ
◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ১৭

উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রাণ ও সেবাকার্য
◻ মানস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৩

মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গারই অপর নাম মা জগদ্ধাত্রী
◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৩১

ভারতে শক্তি সাধনার ইতিহাস (২য় পর্ব)
◻ ড. অনিমেষ চক্রবর্তী ◻ ৩২

ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিনটিই বেছে নিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ
◻ ডাঃ মধুসূদন পাল ◻ ৩৫

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস—বামন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, কয়েকটি প্রসঙ্গ ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ৩৮

মহান বিপ্লবী রাসবিহারী—পিএন ঠাকুর থেকে বোস অব নাকামুরায়া
◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৩

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ◻ কনক চৌধুরী ◻ ৪৭

যখন উত্তরবঙ্গ ডুবছিল, তখন কলকাতায় কার্নিভালের নাচ চলছিল ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৩ নভেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩ নভেম্বর
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্ঘের পঞ্চপরিবর্তন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার শতবর্ষের রাষ্ট্রসেবায় সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পঞ্চ কর্মসূচির সংকল্প গ্রহণ করেছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা মানুষের দ্বারে দ্বারে এই পরিবর্তন বিষয়ে আহ্বান জানাবেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় পঞ্চ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন সঙ্ঘের কয়েকজন অভিজ্ঞ কার্যকর্তা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যে শাসকের সন্ত্রাস

গত ৪ অক্টোবর ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধ্বসের কবলে পড়ে উত্তরবঙ্গ। ৩০ জনের ইহাতে প্রাণহানি ঘটে। নিখোঁজ হন আরও অনেকেই। কয়েক সহস্র মানুষ হন গৃহহীন ও আশ্রয়হীন। ভূমিধসে আক্রান্ত ও বন্যাদুর্গতদিগের সাহায্যার্থে নাগরাকাটা পৌঁছাইয়া যান সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ-সহ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাগণ। গত ৬ অক্টোবর বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের অভিপ্রায়ে তাঁহারা ওই স্থানে আসেন। এমতাবস্থায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনরত জনপ্রতিনিধি দলের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে রাজ্যের শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতী ও জেহাদিরা। প্রথমে প্রবলভাবে হেনস্থার পর শ্রী মুর্মু ও ড. ঘোষকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। খগেনবাবুর আঘাত হয় খুবই মারাত্মক ও গুরুতর। কর্তব্যরত দুই জন সিআইএসএফ-এর নিরাপত্তাকর্মীও এই ঘটনায় আহত হন। জনপ্রতিনিধিদিগের যানবাহনের বহরে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা হয় এবং যান অন্তর্গত যানবাহনেও আঘাত করা হয়। আহত জনপ্রতিনিধিদ্বয়কে চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৮ জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন রুজু করা হইলেও 'হত্যার চেষ্টা'র অভিযোগটি উক্ত এফআইআরে নথিভুক্ত করে নাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। শ্রী মুর্মু জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও 'তপশিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯'-এর প্রয়োজনীয় ধারাও এফআইআরে সংযোজিত হয় নাই। ঘটনার পর 'দ্য ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউলড্ ট্রাইবস্'-এর সদস্যগণ বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছাইয়া চিকিৎসারত শ্রী মুর্মুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। লোকসভার অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এই ঘটনার রিপোর্টও তলব করেন। শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে এই আক্রমণ সংঘটিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে পৌঁছাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনার পর চরম পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। ঘটনায় শাসক দলের যোগ থাকার কারণে বেশ কয়েকদিন কোনো অভিযুক্তই গ্রেপ্তার হয় নাই। প্রবল চাপের মুখে পড়িয়া শেষে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হয় নাগরাকাটা পুলিশ। তাহারা সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর 'দুধেলগাই' সম্প্রদায়ের মানুষ।

এই ঘটনায় মূল অভিযোগ হিংস্র জেহাদিদের বিরুদ্ধে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ ব্যাপক অনুপ্রবেশের কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলারই জনবিন্যাস পরিবর্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের সদস্য, সমর্থক ও জনপ্রতিনিধিগণ এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অহরহ আক্রান্ত হইতেছেন। পূর্বেও ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার যানবহর এই রাজ্যে আক্রান্ত হইয়াছে। নাগরাকাটার ঘটনা 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র' বলিয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের শাসক দলের মুখপাত্রদের পক্ষ থেকে খাড়া করা হইতেছে 'জনরোষ'-এর এক অদ্ভুত তত্ত্ব! আসন্ন নির্বাচনে জয়ের জন্য তাহারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করিয়াছে। বিরোধী দলের নেতৃত্বকে আক্রমণ সেই সন্ত্রাসের উদাহরণ মাত্র। সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে তাহারা জেহাদিদের ব্যবহার করিতেছে। এই জেহাদিরা হইল শাসক দলের নিশ্চিন্ত ভোটব্যাংক। এই জেহাদিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসক দল কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাসক দলের নির্দেশ পালনপূর্বক তাহারা নিজ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মুখোশে পরিচালিত হইয়া থাকে ইসলামিক জেহাদ। জনপ্রতিনিধিদিগের উপর আক্রমণে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছে রাজ্যের শাসক দল। ইহার দ্বারা রাজ্যের জনমানসে সন্ত্রাসের বার্তা প্রেরণ করিতেছে শাসক দল। প্রাক-নির্বাচনী পর্যায়ে বৃহত্তর সমাজকে সন্ত্রস্ত রাখাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলনেত্রীর মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ নিরাপত্তাহীন হওয়ায় সাধারণ মানুষের আদৌ কোনো নিরাপত্তা রহিয়াছে কিনা তাহা বর্তমানে এক গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন রূপে উঠিয়া আসিয়াছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ এই রাজ্যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জেহাদিদের মরুপ্রান্তর হইয়া উঠিতেছে পশ্চিমবঙ্গ। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য ও জেহাদি সন্ত্রাসের কারণে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয়। মহিলারা নিরাপত্তাহীন। রাজ্যের অর্থনীতি অধোগামী। রাজ্য সরকারেরও প্রায় দেউলিয়া পরিস্থিতি। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাও ধ্বংসোন্মুখ। এমতাবস্থায় 'বিরোধীশূন্য রাজ্য' করিবার অভিপ্রায়ে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শাসক দলের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়া অতি আবশ্যক। আগামী বৎসরে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই ভয়াবহ কুশাসনের অবসানের লক্ষ্যে রাজ্যবাসীর সংগঠিত ও সংকল্পবদ্ধ হওয়া আশু প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

অনেকশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্ অল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যম্ হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।।

অর্থ ঃ এই পৃথিবীতে অনেক শাস্ত্র, অনেক জ্ঞান, অনেক জানার বিষয় রয়েছে। কিন্তু সময় অনেক কম, তাতে বাধা-বিপত্তিও অনেক। তাই কেবলমাত্র মূল বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে, হাঁস যেমন দুধ-জলের মধ্যে থেকে শুধু দুধই গ্রহণ করে থাকে।

ভাষাহীন বিপদ আর আপদ উদ্ভূত ফসল নির্মমতার কবে পতন?

অবৈধ জনপ্রিয়তা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নারকীয় অভয়া কাণ্ডের পর কসবা ও দুর্গাপুরে তৃণমূল আশ্রিতদের নোংরামি মানুষ দেখেছেন। রাজ্যপাটের পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর রাজ্য শাসনের প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রশাসন কতটা নীচে নামলে রাজ্য জুড়ে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে তা এর আগে অনেকবার তুলে ধরা হয়েছে। প্রশাসনিক অধঃপতনের নমুনা এখন হাড়ে মজ্জায় টের পাচ্ছে রাজ্যবাসী। এমনকী পড়শি রাজ্যের বাসিন্দারাও এই রাজ্যে এসে ভুক্তভোগী। মুখ্যমন্ত্রীর নিম্নবর্গীয় সাধারণ স্বভাব হলো অসামাজিকতার পালন-পোষণ আর মুসলমান তোষণ। তিনি বলেন যে, তিনি নাকি গুন্ডা কন্ট্রোল করতে পারেন। কিছু উৎকোচ পাওয়ার আশায় একটা গোটা সম্প্রদায় কীভাবে নিজেদের কালিমালিপ্ত করতে পারে তার বড়ো প্রমাণ এখানকার একাংশ মুসলমান সমাজ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে বিহারে প্রায় ৬ শতাংশ বেআইনি ভোটার বাদ পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা অনেক কুৎসিত। টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হচ্ছে যে, সস্তা চিত্রাভিনেত্রীদের হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী নাচছেন আর তার পাশের ছবিতেই দেখা যাচ্ছে যে, লাইন করে শোয়ানো রয়েছে দুর্যোগ বিধ্বস্ত মানুষের মৃতদেহ।

সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাঘ কেন বিপদ আর ব্রিটিশ শাসক কেন আপদ। বিপদের থেকেও তা মারাত্মক। ঘাড় থেকে নামতে চায় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পঞ্চান্ন শতাংশ ভোটারের কাছে তৃণমূল আপদ। এখন রাজ্যের মানুষ বুঝছে কেন তৃণমূলকে ক্ষমতায় নিয়ে এসে তারা রাজ্যকে বিপদে ফেলেছে। ২০১১ সালে মানুষ আপদ সিপিএমকে সরিয়ে তৃণমূল নামক বিপদকে এনেছে। সেই বিপদ এখন অতি বড়ো আপদে পর্যবসিত হয়েছে। তাই আপদ বিদায়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং আপৎকালীন ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে। ২০২৬-এর আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ১৪ হাজার বুথ বেড়ে গিয়ে সারা রাজ্যে বুথ বা ভোটদান কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে প্রায় ৯৫ হাজার। এই মুহূর্তে সাংগঠনিকভাবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসই কেবল ১০০ শতাংশ বুথে কর্মী নিয়োগ করতে পারে। তৃণমূলকে টক্কর দিতে হলে বিজেপিকে এই সংখ্যার কাছাকাছি পৌঁছতে হবে, যদি না প্রবল জনরোষে তৃণমূলের নৌকা ওলটায়। ২০১১-র ভোটে তৃণমূলের সংগঠন দুর্বল ছিল, তবে মানুষ সিপিএমকে ধসিয়ে দিয়েছিল। বাম জমানায় লেখা হতো--- 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য'। এই ডাহা মিথ্যাটিকে সিপিএম লাঠির জোরে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাত। 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' তেমনই এক মার্কসবাদী ধরনের মিথ্যা। রাজনৈতিক হিংসা, জেহাদি সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন হলো তৃণমূলের দেনাপাওনার হিসাব, মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী পরিচালিত রাজ্য সরকারের আসল রিপোর্ট কার্ড। মিথ্যা তার সহোদর। সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক ড. শঙ্কর ঘোষের ওপর সংঘটিত আক্রমণ প্রমাণ করেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায় তাদের জেহাদি ও দুষ্কৃতীদের তৃণমূলের কাছে ভাড়া খাটায়। কতটা স্বার্থ থাকলে একটি সম্প্রদায় তার মর্যাদা জলাঞ্জলি দিতে রাজি থাকে!

তবে সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতায়নের ফলে আগামী নির্বাচনে মুসলমান ভোটে ভাঙন ধরার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। খগেন মুর্মুর ওপর আক্রমণ সাধারণ মানুষ থেকে তৃণমূলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বড়ো প্রমাণ। তাই গায়ের জোর খাটিয়ে এবং ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে ভোটারদের বুথ থেকে দূরে রাখতে চায় জনবিচ্ছিন্ন তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ-প্রশাসন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার আগেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি প্রমাণ করছে যে, আগামী নির্বাচন নিয়ে তিনি আসলে শঙ্কিত। নতুন ভোটার তালিকায় মৃত ও অবৈধ ভোটারদের নাম পড়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ভোটের ব্যবধান মাত্র পাঁচ শতাংশের। রাজ্যের সাড়ে সাত কোটির কিছু বেশি ভোটারের তুলনায় যা যৎসামান্য। বিজেপির দাবি— বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর রাজ্যে অন্তত এক কোটি ভোটার কমবে।

রাজ্যের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার আগে সিপিএম যত ধরনের অনিষ্ট করেছিল তৃণমূলের সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল। দেহ সন্ত্রাসের ভিতর দিয়েই সিপিএমের মৃত্যু পরোয়ানা লেখা শুরু হয়। খগেনবাবুকে যারা আক্রমণ করেছে এবং দুর্গাপুরে যারা ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে নির্যাতন করেছে প্রায় সকলেই সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতী। তৃণমূলনেত্রী শাসিত রাজ্যে দুষ্কৃতী আর সন্ত্রাসবাদী শব্দ দু'টি মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এখন সমার্থক হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের ওপর সাম্প্রদায়িক হানা যে কোনোভাবেই জনরোষ নয়, বরং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উসকে দেওয়ার জ্বলন্ত নথি— তৃণমূল নেতারা এই সত্য কিছুতেই এড়াতে পারছেন না। বিধানচন্দ্র রায় ও জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে না হেরে বিদায় নিয়েছিলেন। বিধান রায় তাঁর জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং জ্যোতি বসুকে তার দল কুলোর বাতাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই তাই চর্চা চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিদায় কীভাবে হতে পারে। তৃণমূলনেত্রীর সুবিধা হলো তিনি সহজেই অবৈধতার ভাষা হজম করতে পারেন। তাঁর এই 'নাহি লাজ নাহি অপমান'-এর ভাবনা বাকি দু'জনের থেকে আলাদা। ২০২১-এর ভোটে নন্দীগ্রামের হার অনেক আগেই তৃণমূলনেত্রীর জনপ্রিয়তাকে অবৈধ ও প্রাক্তন করেছিল। এখন রাজ্যবাসী অপেক্ষায় রয়েছেন ২০২৬-এ আদৌ কি ঘাড় থেকে নামবে 'বেতাল তৃণমূল' নামক আপদ! প্রমাণ করা যাবে যে, মার্কসীয় লাঠির মতন তৃণমূলনেত্রীর শাসনও বেআইনি?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভবানীপুরে ভয় দিদির

ভয়েভয়েষু দিদি,

গত বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছিলেন। মেজো বোন নন্দীগ্রামে লজ্জার হারের পরে বড়ো বোন ভবানীপুরে উপনির্বাচনে জয়। কিন্তু এবারে ভবানীপুরে হারের জুজু দেখতে পাচ্ছেন কেন আপনি! জানি নন্দীগ্রামে হারের লজ্জা সারা জীবন তাড়া করবে আপনাকে। ১৯৮৯ সালে মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে হারের চেয়েও এটা লজ্জার। এবার ভবানীপুর নিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত নন।

নন্দীগ্রামে ১,৯৫৬ ভোটে জিতেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পরে উপনির্বাচনে আপনি জিতেছেন ৫৮ হাজার ৮৩৫ ভোটে। তবু ভয় পাচ্ছেন। আসল অঙ্কটা দিদি লুকিয়ে কলকাতার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে। খিদিরপুর লাগোয়া এই ওয়ার্ডে এখন মুসলমান ভোটার বেশি। আর আপনাকে জেতায় তো এই ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছে আমি জানি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে প্রথম ধাক্কা খায় তৃণমূল। সেই নির্বাচনে ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২ ও ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভালো ব্যবধান পেয়ে ভবানীপুর বিধানসভা থেকে ১৭৬ ভোটে এগিয়েছিলেন বিজেপির প্রার্থী তথাগত রায়। তৃণমূলকে বাঁচিয়ে দেয় ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড।

২০১৫ সালের পুরসভা ভোটে ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী অসীম বসু। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরেই তাঁকে কিনে নেয় তৃণমূল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী চন্দ্র কুমার বসু তৃতীয় হলেও, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১৮০০ ভোটে এগিয়েছিলেন। সে বার আপনি ২৫ হাজার ভোটে জিতলেও শুধু ৭৭ থেকে ১০ হাজার লিড।

আবার ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ভবানীপুর বিধানসভায় ৭৭ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ড বাদ দিয়ে সবক'টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। এমনকী আপনার নিজের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডেও বিজেপি এগিয়ে গিয়েছিল ৪৯৬ ভোটে। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছ'টি ওয়ার্ডে এগিয়ে থাকলেও ৭০ ও ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে যথাক্রমে ২০৯২ ও ৫৩৭ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

আসলে কলকাতার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড হচ্ছে আপনার দুধেল গাই অধ্যুষিত। সঙ্গে রয়েছে ববি হাকিমের ৮২ নম্বর ওয়ার্ড।

দিদি, আপনি আসলে অবাংলাভাষী ভোটারদের ভয় পাচ্ছেন। হুমকিটা তাদেরই। কারণ, কলকাতার এই বিধানসভা এলাকা আসলে মিনি ভারতবর্ষ। সব প্রদেশের লোকেরা থাকেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গুজরাতি, রাজস্থানি, বিহারি, উত্তরপ্রদেশের। অনেক শিখ থাকেন। তাঁদেরই আপনি এবার বহিরাগত বলে দিলেন।

উপনির্বাচনে সাধারণত শাসকদলই জেতে। তাও আবার মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা! ২০২১ সালের অক্টোবরে হওয়া উপনির্বাচনে একা ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড অপনাকে এগিয়ে দেয় প্রায় ২২ হাজার ভোটে। আর ৮২ লিড দেয় ১৬ হাজারের। এখানেই ৩৮ হাজার। বাকি ছটি ওয়ার্ড মিলিয়ে লিড হয় ২০ হাজারের মতো।

গত ১৪ বছরে ৭৭-এর জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। কাউন্সিলার শামিমা রেহান খান। ফব থেকে এসে তৃণমূলে। এখানে বেশিটাই উর্দুভাষী মুসলমান। ফলে এসআইআর হলে চাপ আছে। ভবানীপুর আসনের বিজয়া সম্মিলনীতে আপনি বলেছেন, 'ভবানীপুরটা পুরো আউটসাইডারদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরো একটা প্ল্যানিং করে। যাঁরা হঠাৎ করে বাইরে থেকে এসে টাকা খরচ করে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করে, কাউকে লোকালি কিছু টাকা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।' আমি না কিছু বুঝিনি। কাদের টাকা দেয়! গোটা এলাকাটা তো তৃণমূলের। ফিরহাদ হাকিম তো ছিলেন মঞ্চে। তিনি তো মেয়র। তবে কাকে টাকা দিয়ে বেআইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে! যদি সময় করে মুখ্যমন্ত্রী দিদি একটু জবাব দেন খুব ভালো হয়। ওটুকুই নয়। আপনি এটাও বলেছেন যে, 'সামনে লক্ষ্য রাখবেন যদি নতুন করে ভোটার লিস্ট হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেককে আবার নতুন করে সবকিছু করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিএলএ-দের দায়িত্ব খুবই বেশি।'

বুঝেছি দিদি, আপনি আসলে অবাংলাভাষী ভোটারদের ভয় পাচ্ছেন। হুমকিটা তাদেরই। কারণ, কলকাতার এই বিধানসভা এলাকা আসলে মিনি ভারতবর্ষ। সব প্রদেশের লোকেরা থাকেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গুজরাতি, রাজস্থানি, বিহারি, উত্তরপ্রদেশের লোকজন ছাড়াও শিখরাও থাকেন। তাঁদেরই আপনি এবার বহিরাগত বলে দিলেন। বাঃ। দিদি বাঃ।□

অতিথি কলম

বিজয় কুমার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পরম্পরা

একশো বছরে সঙ্ঘের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। সঙ্ঘকে যুগানুকূল রাখা হয়েছে। এটি জীবন্ত সংগঠনের প্রতীক। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি জীবন্ত সংগঠন। স্বয়ংসেবকদের কাছে এটি গর্বের বিষয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক বিকাশশীল সংগঠন। কেবল শাখা বা বিবিধ কাজই নয়, প্রেরণাদায়ী অনেক পরম্পরাও আপনা থেকেই বিকশিত হয়ে চলেছে। পরিবারভিত্তিক সংগঠন হওয়ার কারণে এখানে প্রতিটি কাজের জন্য সংবিধান দেখতে হয় না। যাঁরা সঙ্ঘের কার্যপ্রণালী জানেন, তাঁদের কাছে এটা অতি সাধারণ কথা। যদি আমরা সরসঙ্ঘচালক পরম্পরা দেখি তো আদ্য সরসঙ্ঘচালক প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীকে তাঁর সহযোগীরা তাঁর অনুমতি না নিয়েই তাঁকে সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা করেছিলেন। ডাক্তারজী তখন বলেছিলেন, 'আপনাদের আদেশ মনে করে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কিন্তু যখনই আমার থেকে যোগ্য কাউকে পাবেন, তাঁকেই আপনারা এই দায়িত্ব অর্পণ করবেন। আমি একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক হিসেবে কাজ করে যাব।' যখন ডাক্তারজীর শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল তখন তিনি তাঁর অপারেশনের আগেই সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সবার সামনে শ্রীগুরুজীকে বলেছিলেন ' আমার পরে আপনাকে সঙ্ঘের কাজ সামলাতে হবে।' এভাবেই সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালকের ঘোষণা হয়েছিল।

যখন শ্রীগুরুজীর মনে হয়েছিল তাঁর শরীর আর বেশিদিন সাথ দেবে না তখন তিনিও তাঁর সহযোগী কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং একটি পত্রে পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসেবে শ্রীবালাসাহেব দেওরসের নাম লিখে রাখেন। তাঁর প্রয়াণের পর সেই পত্র খোলা হয়েছিল। এতে জনমানসে ধারণা হয়েছিল যে, সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব আজীবনের এবং পর্ববর্তী সরসঙ্ঘচালকের ইচ্ছাতেই যে কাউকে এই পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। সঙ্ঘ বিরোধীরা এজন্যই সঙ্ঘকে গুপ্ত সংগঠন বলত এবং তারা এটাকে অগণতান্ত্রিকও মনে করত।

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস তাঁর জীবদ্দশাই পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর শরীর ভীষণভাবে খারাপ হয়ে যাওয়ায় অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জু ভাইয়া)-কে তাঁর পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা করেছেন। রজ্জু ভাইয়া ও সুদর্শনজীও এমনটাই করেছেন।

এভাবেই সঙ্ঘে এক নতুন পরম্পরা বিকশিত হয়েছে। এই ঘটাক্রমকে আর একভাবে দেখা যেতে পারে। যখন বালাসাহেব দেওরস দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে হুইল চেয়ারেই চলাফেরা করতে হতো। মুখ সবসময় লালায় ভরে যেত। সমস্ত কাজকর্ম অন্য কারও সহযোগিতায় করতে হতো। কথাও ঠিকমতো বলতে পারতেন না। বৈঠকে বা কার্যক্রমে তাঁর লিখিত বার্তাই পড়ে শোনানো হতো। সেজন্য তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি সকলেই সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল।

অন্যদিকে রজ্জু ভাইয়া যখন দায়িত্বমুক্ত হন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ছিলেন না কিন্তু ঘোরাঘুরি করতে পারতেন। ভাষণ দিতে তাঁর অসুবিধা হতো কিন্তু স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারতেন। দায়িত্বমুক্ত হয়েও তিনি সারা দেশে ঘোরাঘুরি করেছেন। অর্থাৎ তিনি যদি চাইতেন তাহলে আরও কিছুদিন এই দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তি পেয়ে গিয়ে তার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন।

পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক শ্রীকুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন দায়িত্বমুক্তি পর্যন্ত যথেষ্ট সুস্থ ছিলেন। সারা দেশে ঘোরাঘুরি করতে এবং ভাষণ দিতেও তাঁর কোনা অসুবিধা হতো না। কিন্তু যখন তাঁর মনে হলো যে মোহনরাও ভাগবতের মতো একজন সুযোগ্য ও প্রাণবন্ত কার্যকর্তা সামনে এসে গেছেন, তখন তাঁর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করাটাই উচিত মনে করলেন। অর্থাৎ তিনি সেটাই করলেন যা প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ার সরসঙ্ঘচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, এই সঙ্ঘের জন্মদাতা তথা প্রতিষ্ঠাতা আমি নই, আপনারা সবাই। আপনাদের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্ঘের, আপনাদের ইচ্ছায় ও আদেশে আমি ধাত্রীর কাজ করছি। যতদিন আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশ হবে, ততদিন আমি সঙ্ঘের দায়িত্ব পালন করে যাব। এই কাজ করার সময় যতই সংকট আসুক, মান-অপমান সহ্য করার প্রসঙ্গ আসুক, আমি কখনো পিছু হঠবো না।

আমার যোগ্যতা না থাকায় সঙ্ঘকাজের ক্ষতি হচ্ছে বলে আপনাদের মনে হলে যোগ্য কার্যকর্তাকে এই পদের জন্য খুঁজে নেবেন। আপনাদের আদেশে যত আনন্দের সঙ্গে এই দায়িত্ব আমি স্বীকার করেছি, ততটাই আনন্দের সঙ্গে আপনাদের দ্বারা নিযুক্ত কার্যকর্তার হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করে সাধারণ স্বয়ংসেবক হিসেবে তাঁর আজ্ঞাবহ রূপে কাজ করে যাবো। আমি খোলা মনে বলছি, যখন আমার থেকে যোগ্যতর কার্যকর্তা সামনে আসবেন তখন আপনারা তাঁকেই সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন।'

পুরনো ভিত, নতুন নির্মাণ

আরও একভাবে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর অন্তিম সংস্কার রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানে হয়েছে। সেখানে তাঁর স্মৃতি মন্দির রয়েছে। তার বাহ্যিক রূপ মন্দিরের মতো কিন্তু সেখানে পূজার্চনা, ঘণ্টা, ভোগরাগ, আরতি, প্রসাদ ইত্যাদি কিছুই নেই। স্মৃতি মন্দিরে ডাক্তারজীর সুন্দর প্রতিকৃতি রয়েছে, তার তিনদিকেই খোলা। অর্থাৎ সঙ্ঘে ব্যক্তির গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু ব্যক্তিপূজার নয়।

দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী তাঁর প্রয়াণের আগেই তিনটি পত্র লিখে গিয়েছেন। প্রথম পত্রে লিখেছেন তাঁর পরবর্তী সরসঙ্ঘচালকের নাম, দ্বিতীয় পত্রে লিখেছেন, প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীর মতো তাঁর যেন কোনো স্মারক নির্মাণ করা না হয়। সেজন্য স্মৃতি মন্দিরের সামনে যেখানে তাঁর দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে যজ্ঞজ্যোতির মতো ছোটো একটি 'স্মৃতিচিহ্ন' বানানো হয়েছে। তার ওপরে সন্ত তুকারামের একটি অভঙ্গের সেই পঙ্ক্তি উৎকীর্ণ রয়েছে যা শ্রীগুরুজী তাঁর তৃতীয় পত্রে সমস্ত স্বয়ংসেবকের উদ্দেশ্যে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন।

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীবালাসাহেব দেওরস আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, 'রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানকে আমরা যেন সরসঙ্ঘচালকদের শ্মশানে পরিণত না করি। এজন্য আমার দাহকার্য সর্বসাধারণের জন্য যে শ্মশান, সেখানেই যেন করা হয়।' তাঁর দেহাবসান পুণেতে হয় কিন্তু তিনি নাগপুরেই বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেছেন, সেখানেই তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন, তাই তাঁর মরদেহ নাগপুরে এনে সর্বসাধারণের শ্মশান গঙ্গাবাঈ ঘাটে দাহকার্য করা হয়।

চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক রজ্জু ভাইয়ার দেহাবসান পুণেতে হয়। একবার তিনি বলেছিলেন, যেখানেই তাঁর দেহাবসান হবে সেখানেই যেন তাঁর মরদেহের অন্তিম সংস্কার করা হয়। তাই-ই হয়েছে।

একথা পরিষ্কার যে, সমস্ত সরসঙ্ঘচালকই নিজেদের বিশিষ্ট থেকে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। এক সময় সঙ্ঘের ওপর মরাঠাদের সংগঠন, ব্রাহ্মণ্যবাদী, চিৎপাবন ব্রাহ্মণবাদী সংগঠন ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো। কিন্তু যখন উত্তরপ্রদেশের রজ্জু ভাইয়া এবং কর্ণাটকের সুদর্শনজীর ওপর সরসঙ্ঘচলেকের দায়িত্বভার আসে, তখন সঙ্ঘ বিরোধীদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। যারা সঙ্ঘকে পুরাতনপন্থী, পরম্পরাবাদী, কট্টরপন্থী ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেন, তাদের সরসঙ্ঘচালক পরম্পরা বিষয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

একশো বছরে সঙ্ঘের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। সঙ্ঘকে যুগানুকূল রাখা হয়েছে। এটি জীবন্ত সংগঠনের প্রতীক। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি জীবন্ত সংগঠন। স্বয়ংসেবকদের কাছে এটি গর্বের বিষয়।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

শোক সংবাদ

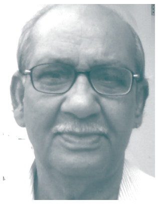

কোচবিহার জেলার পূর্বতন জেলা ও বিভাগ সঙ্ঘচালক সুদর্শন চক্রবর্তী গত ২২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গ্রামীণ হাওড়া জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ সমীরণ রায়ের সহধর্মিণী মমতা রায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ২ কন্যাকে রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলা একল অভিযানের পূর্ণকালীর কার্যকর্তা নির্মল কুমার দাস গত ৭ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। উল্লেখ্য, তাঁর দাদা বীরভূম জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার সহজেলা গ্রাম বিকাশ প্রমুখ প্রদীপ দেবাংশীর বাবা নন্দগোপাল দেবাংশী গত ১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার সিউড়ী-২ খণ্ড কার্যবাহ বাবন মণ্ডলের বাবা শ্রীধর মণ্ডল গত ৩ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১পুত্র, ১কন্যা ও ২ নাতনি রেখে গেছেন।

২০২৬-এর ভোট জয়ের উদ্দেশ্যে জেহাদিদের সবুজ সংকেত দিচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী

২০১১ সালে কংগ্রেস ও এসইউসিআই-কে সঙ্গে নিয়ে জিতে পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষমতায় এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন ঘোষণা করেছিলেন, 'বদলা নয়, বদল চাই'। রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে তিনি রবীন্দ্র সংগীত বাজালেন। বহু বামপন্থী হার্মাদ যারা ভোটের পর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এল। এইভাবে চলতে চলতে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লো তৃণমূলের বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা-মন্ত্রীরা। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী নিজেকে পালটানো শুরু করলেন। চূড়ান্ত সন্ত্রাস শুরু হলো গ্রামবাঙ্গলায়। তারপরও সেই নির্বাচনে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে হারলো তৃণমূল। কিন্তু এই তিনটি জেলা হাতে না পেলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ তথা মুসলমান ভোটব্যাংকের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পরের তিন বছর রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীকে ব্যবহার করে একে একে মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ দখল হলো। এরপর এই জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলেও তৃণমূলের পঞ্চায়েত নেতাদের দেওয়া হলো লাগামহীন সন্ত্রাসের লাইসেন্স।

২০১৬ সালের রাজ্য বিধানসভা ভোটে সিপিএম-কংগ্রেস জোট বিরোধী আসনে এলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে টক্কর দিতে তারা ব্যর্থ হয় এবং সেই সময় খড়্গপুর থেকে জিতে আসা বিধায়ক দিলীপ ঘোষ একা রুখে দাঁড়ান তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন বাড়তে থাকে। তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই শুরু হয়। বিপুল জনসমর্থনের দরুন ২০১৯-এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দেখা দেয় বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়যুক্ত হন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কড়া টক্করের সাক্ষী থাকে রাজ্যবাসী। বামপন্থীরা রাজ্যে পরিণত হয় একটি ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিতে। রাজ্যজুড়ে তারা 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচার চালায়। তৃণমূলকে তারা 'লেসার ইভিল' আখ্যা দেয়। মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন এবং বাম ও অতি-বামেদের 'লেসার ইভিল' তত্ত্বকে হাতিয়ার করে ২০২১-এ ৫ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে নিয়ে জয়লাভ করে তৃণমূল।

এই জয়ের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বীভৎস অত্যাচার শুরু করে তৃণমূল। উদ্দেশ্য সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করা। সমাজ, প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যমের বিরোধী কণ্ঠস্বরকে খতম করতে রাজ্য জুড়ে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে শাসক দল তৃণমূল আশ্রিত জেহাদি ও সমাজবিরোধীরা। তৃণমূল সরকারের একটা অলিখিত নিয়ম রয়েছে। প্রতি থানাকে চলতে হয় স্থানীয় বিধায়কের নির্দেশে। আর এই নিয়মের কারণেই শুরু হলো জেহাদি ও দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত। দলনেত্রীর কাছে নিজের দর বাড়াতে প্রত্যেক তৃণমূল বিধায়ক পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির রাজনৈতিক কর্মী, সমর্থকদের ওপর চালানো শুরু করল চরম অত্যাচার। প্রায় ৬০ জন বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়। বহু মহিলার সম্ভ্রমহানি করা হয়। বহু বাড়ি ভাঙা হয়। এছাড়াও বাড়িঘর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিজেপি কর্মীদের দোকান, গাড়ি, অটো-রিকশা, টোটো ভাঙচুর করা হয়। বিরোধী মনোভাবাপন্ন হকারদের কাজ বন্ধ করা হয়। তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়। এমনকী ছাড়া হয় না ফলতার বিজেপি প্রার্থীকেও।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তপশিলি জাতি কমিশন, তপশিলি উপজাতি কমিশন, মহিলা কমিশন বার বার এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে আসে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের বিভিন্ন ঘটনার তদন্তভার কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই-কে দিলেও তদন্তের ক্ষেত্রে দেখা যায় শম্বুকগতি। ফলে তৃণমূলের অত্যাচারী নেতা-মন্ত্রী, বিধায়ক, হার্মাদ ও জেহাদিদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পরও বাড়ে অত্যাচার। রাজ্যে গণতন্ত্রের পরিসর আরও কমে। জেহাদিদের আত্মবিশ্বাস বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছায় যে আজ বিরোধী দলের সাংসদ ও বিধায়কদের ওপরও প্রাণঘাতী হামলা করতে তারা পিছপা হয় না। এখানে যেটা আরও ভয়ংকর ব্যাপার তা হলো প্রতিটি হামলার পর রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয় থাকা। দুষ্কৃতী ও জেহাদিদের হাতে প্রহৃত সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে সাক্ষাৎ করে বাইরে বেরিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অবলীলাক্রমে এই আক্রমণকে ছোটো করে দেখান। উদ্দেশ্য একটাই। তার মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, হার্মাদ, উন্মাদদের আরও বেশি সন্ত্রাসে অনুপ্রাণিত করা। গোটা রাজ্যের সব সমাজবিরোধীই চলছে তারই অনুপ্রেরণায়। সামনে ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা ভোট। সেই ভোট জয়ের উদ্দেশ্যে জেহাদিদের সবুজ সংকেত দিচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। তার ভাবখানা হলো— 'তোমরা যা ইচ্ছা করো। আমি আছি। কোনো কমিশন, কোনো বিচারব্যবস্থা, কোনো সরকার তোমাদের ছুঁতে পারবে না।' □

উত্তরবঙ্গে লুটের মহাকাব্য

প্রকৃতির কান্না আর রেড রোডের কার্নিভালে তুরুক তুরুক নাচ

সাধন কুমার পাল

বিপর্যয়ের দিনে উৎসবের উল্লাস

গত ৪ অক্টোবর, শনিবার রাতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেঁপে উঠেছিল দার্জিলিঙের পাহাড়-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ। ৫ অক্টোবর রবিবার সকালে ভেসে ওঠে ধ্বংসের বিভীষিকা— প্রায় ২৮ জনের মৃত্যু, অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ।

কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দিনই কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপূজার কার্নিভালে অংশ নিলেন— একঝাঁক তারকার সঙ্গে নৃত্য ও আনন্দে মেতে উঠলেন। এই দৃশ্য দেখে পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ হতবাক। যখন উত্তরবঙ্গ দুঃসহ বেদনায় কাঁপছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উৎসবের আলোয় উজ্জ্বল!

সোশ্যাল মিডিয়ায় তখন ভাইরাল হচ্ছিল একটি পোস্ট—

'উত্তরবঙ্গে মৃত্যু ২৮, মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় নাচে ব্যস্ত! প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করেছেন দুপুরে ১২টা ৪২ মিনিটে, মুখ্যমন্ত্রী করেছেন ১টা ৫৮ মিনিটে। কলকাতায় এক পশলা বৃষ্টি হলে রাজ্যজুড়ে স্কুল বন্ধ হয়, আর উত্তরবঙ্গের মৃত্যু ও বিপর্যয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়!'

বিপর্যয়ের সময় রাজ্য প্রশাসনের অনুপস্থিতি স্পষ্ট। এনডিআরএফ ও ভারতীয় সেনা উদ্ধারকাজে নেমেছে, কিন্তু রাজ্যের কোনো প্রশাসনিক প্রতিনিধি দৃশ্যমান নয়।

বিরোধীরা অকুস্থলে, মুখ্যমন্ত্রী দূরে

গত ৫ অক্টোবর সকালেই বিজেপির নেতারা— রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাংসদ রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়, আনন্দময় বর্মণ, দীপক বর্মণ-সহ অন্যান্যরা বিপর্যয়স্থানে পৌঁছে যান। কিন্তু তাঁদের মানবিক উদ্যোগের জবাব মেলে হামলার মাধ্যমে।

বিপর্যয় রাজনীতিতে ব্যাকফুটে যাওয়ার জন্য বামনডাঙায় মুখ্যমন্ত্রীর রোষ যেন তৃণমূল কর্মীদের মারমুখী আচরণে প্রতিফলিত হয়। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর চড়াও হয় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। জুতো, লাঠি, পাথর উড়ে আসে, গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চলে। রক্তাক্ত হন খগেন মুর্মু।

> **তৃণমূল কেবল রেশন বা চাকরি চুরি করেনি— চুরি করেছে উত্তরবঙ্গের প্রাণ, প্রকৃতির হৃদস্পন্দন। আর যারা এই চুরির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে খগেন মুর্মুর মতো রক্তাক্ত।**

বিপর্যয়ের সময় দলমত নির্বিশেষে ত্রাণে অংশ নেওয়া মানবতার পরিচয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই সংস্কৃতি মৃতপ্রায়। সিপিএম আমলের 'জনরোষ'-এর অজুহাত আজ তৃণমূলের মুখে ফিরে এসেছে। মমতা ব্যানার্জির 'বদলা নয়, বদল চাই' স্লোগান এখন শুধু রং বদলের ইতিহাস— লাল থেকে নীলসাদা।

ম্যানমেড বিপর্যয়

রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকে 'ম্যানমেড' বলে দায় চাপিয়ে দেন হয় কেন্দ্রের ঘাড়ে নতুবা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ঘাড়ে। উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়কেও মুখ্যমন্ত্রী ম্যানমেড বলেছেন। আক্ষরিক অর্থেই এটা একটা ম্যানমেড বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সবাই সম্পূর্ণ একমত। ১৫ দিন আগে থেকে অতি বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন লোককেও বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরানো হয়নি। তার ফল হচ্ছে এতগুলো মানুষের মৃত্যু। বিপর্যয়ের পরে চারদিকে ত্রাণের হাহাকার। অথচ বিরোধী দল বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের রক্তাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে বিপর্যয়স্থল পরিদর্শন এবং ত্রাণ বিলি করার অপরাধে।

করোনা ও বিপর্যয় : একই রাজনীতি

ফঃ ২

করোনার সময়ও একই চিত্র--- বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীদের গৃহবন্দি করে রাখা, ত্রাণ বিলি বন্ধ করা, প্রশাসনিক নিপীড়ন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার কান্না, বালুরঘাটের এমপি ড. সুকান্ত মজুমদার ও দেবশ্রী চৌধুরীর গৃহবন্দি অবস্থা— সবই সেই ইতিহাসের কালো পৃষ্ঠা। তৃণমূলের এক নেতা তখন অকপটে বলেছিলেন—

'সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল, আমরা সেখান থেকেই শুরু করেছি।'

উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির উপর দখলদারি

উত্তরবঙ্গ আজ প্রকৃতির নয়, রাজনীতির শিকার। নদী, পাহাড়, বন, চর— সব কিছু দখলদারির কবলে। তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রয়ে চলছে অবৈধ নির্মাণ, বালি ও পাথর চোরাচালান, গাছ কাটা, চর দখল। প্রশাসন জানে— কিন্তু নীরব।

জলঢাকার বুকের বালি চোরাচালান

বিগত বছরগুলিতে নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি ব্লকে প্রায় এক লক্ষ ঘন মিটার বালি পাচার হয়েছে। রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে সিন্ডিকেটের ট্রাকের সারি। নদীর বুক ভরাট হয়ে চর গড়ে উঠছে, যেখানে চলছে চাষ, বসতি ও ব্যবসা। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফল— প্রতি বছর বন্যা ও নদীভাঙন।

মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই

বন্যা, জমি চাপা পড়া, চাষের ক্ষতি, মৎস্যচাষের ধ্বংস— সব মিলিয়ে এক অসহায় জীবনযুদ্ধ। ধূপগুড়ির ১৩ হেক্টর ধানক্ষেত হারিয়ে গেছে বন্যায়। প্রশাসন নিশ্চুপ— কারণ প্রকৃতির ক্ষতির থেকেও বড়ো তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক মুনাফা।

বন উজাড় ও বন্যপ্রাণীর বিপর্যয়

তিস্তার বানে ভেসে আসা কাঠের স্তূপে চোখে পড়ছে সাদা চন্দনও। প্রশ্ন, উত্তরবঙ্গে চন্দন কাঠ এল কোথা থেকে? জঙ্গল কেটে, পাহাড় ভেঙে, নদী বক্ষ ভরাট করে তৈরি হয়েছে রিসোর্ট, হোমস্টে, বেআইনি হোটেল। জঙ্গল উজাড় হওয়ায় হাতি, বাইসন, গণ্ডার, বাঘ আজ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে— প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে।

আদালতের নির্দেশে কান নেই সরকারের

কলকাতা হাইকোর্ট ও গ্রিন বেঞ্চ বারবার সতর্ক করেছে, কিন্তু তৃণমূল সরকারের কানেই যায়নি। গ্রামের মানুষ যদি দু'দিন বালি তোলেন, পুলিশ তেড়ে আসে; অথচ শাসকদলের মদতে ট্রাকের পর ট্রাক বালি পাচার চলে প্রশাসনের নাকের ডগায়।

ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রশাসনিক হিংসা

প্রকৃতির ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের উপর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক হিংসা। নদীর গতিপথ বদল, বন উজাড়, চাষের জমি দখল— সব কিছুর প্রতিবাদে যারা মুখ খোলে, তাদের উপরে নেমে আসে দমনপীড়ন। সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বারবার অভিযোগ করলেও মেলে না পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ বা চিকিৎসা সহায়তা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে।

ত্রাণ নিয়ে অমানবিক বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ আসতেই এক তৃণমূল নেতা অকপটে স্বীকার করছেন সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল আমরা ঠিক ওখান থেকেই শুরু করে দিয়েছি। শুধু বিপর্যয়ের সময়ে ত্রাণ বিতরণে বাধা নয়, দীপাবলীর পর থেকে বিজেপি-সহ রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক যেকোনো সংগঠনের কাজকর্মের উপর প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। অর্থাৎ ২০-২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূল বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলকে ও সামাজিক সংগঠনকে প্রকাশ্যে কোনো কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না। এই জন্য যা যা করার প্রয়োজন তার সবটাই দল ও প্রশাসন মিলে করবে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ শুরু

প্রকৃতি বারবার সতর্ক করেছে— বন্যা, খরা, নদীভাঙন, মাটির উর্বরতা হ্রাস— সবই মানুষের লোভের বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিবাদ। নাগরাকাটা থেকে ফালাকাটা, জলঢাকা থেকে হাসিমারা— সব জায়গাতেই প্রকৃতি আজ ক্রুদ্ধ।

শেষ কথা

উত্তরবঙ্গের নদী, বন, পাহাড় শুধু ভূখণ্ড নয়— উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনরেখা। কিন্তু রাজনীতির লোভে এবং শাসকদলের দখলদারিতে সেই জীবনরেখা আজ মৃতপ্রায়।

প্রকৃতির প্রতিটি ঢেউ, প্রতিটি হাওয়া যেন আজ বলছে—

'তোমরা প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, এখন প্রকৃতি তার হিসাব নিচ্ছে।'

সংক্ষেপে :

তৃণমূল কেবল রেশন বা চাকরি চুরি করেনি— চুরি করেছে উত্তরবঙ্গের প্রাণ, প্রকৃতির হৃদস্পন্দন। আর যারা এই চুরির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে খগেন মুর্মুর মতো রক্তাক্ত।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

নাগরাকাটায় আক্রান্ত বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক : সংখ্যা ও তথ্যভিত্তিক কারণ অনুসন্ধান

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি শ'য়ে শ'য়ে সাধারণ বিজেপি কার্যকর্তার মৃত্যু ও চরম দুর্ভোগ বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে টলাতে না পারলেও, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর দুষ্কৃতীদের অতর্কিত হামলা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মনে বুঝি-বা কেটেছে গভীর দাগ। টনক নড়েছে দিল্লির।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মেয়াদকাল শুরু হওয়ার পর থেকে শাসকের সুপরিকল্পিত হিংসার শিকার আক্ষরিক অর্থেই হয়েছেন শ'য়ে শ'য়ে সাধারণ বিজেপি কার্যকর্তা। অথচ দু'তিনজন বিধায়ক স্তরের নেতাকে বাদ দিলে এযাবৎকাল গায়ে তেমন হাত পড়েনি বিজেপির নেতৃবৃন্দের এবং তাঁরা ছিলেন মোটামুটি অক্ষতই। অথচ এবার নাগরাকাটায় মালদা উত্তর সংসদীয় ক্ষেত্রের সাংসদ খগেন মুর্মুকে মারা হয়েছে এমনভাবে যে সাংসদ মারা যেতে পারতেন। খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণটি ছিল 'হত্যার চেষ্টা' পদবাচ্য এক অপরাধকর্ম যে চেষ্টাটি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে এরকম শ'য়ে শ'য়ে 'হত্যার চেষ্টা' সফল হয়েছে, যার ফলে মারা গিয়েছেন শ'য়ে শ'য়ে বিজেপি কার্যকর্তা। কিন্তু খগেন মুর্মু এ যাত্রা বেঁচে গিয়েছেন।

এহেন আক্রমণের ঘটনার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি কাউকেই যদিও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অবহিত কোনো ব্যক্তিই তাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি। কারণ নানা প্রকারের অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশি সক্রিয়তার পরিবর্তে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাই বরং বর্তমানে এ রাজ্যের স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে দিল্লি যে অপরাধীদের পাকড়াও করার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সক্রিয়তার প্রত্যাশা রেখেছে তাতেই বরং বিস্মিত হয়েছেন অনেকে। লোকসভা স্পিকারের অফিস থেকে ওই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

> এতদিন পর্যন্ত শাসকাশ্রিত গুন্ডারা মেরেছে বুথ ও স্থানীয় স্তরের বিজেপি কার্যকর্তাদের। বিজেপির পক্ষে দাঁড়ালে যে কোনো মানুষের পরিণতিই যে ভয়ানক হতে পারে, রাজ্যের সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে সেই বার্তা দেওয়ার জন্য ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে তারা বিজেপির নেতা ও কর্মীদের নিশানা করছে।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাবধারাকে অমান্য করার জন্য সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্ৎসনা করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ, সুধাংশু ত্রিবেদী, গিরিরাজ সিংহের মতো বিজেপি নেতারা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পশ্চিমবঙ্গের সেই 'শহুরে মাওবাদী'দের হাতের একপ্রকার পুতুলে পরিণত হয়েছেন যে 'শহুরে মাওবাদী'রা 'জামাত-এ-ইসলামি'র মতো কট্টরপন্থী ইসলামিয়

সংগঠনগুলির সঙ্গে গড়ে তুলেছে ঘোর অশুভ এক আঁতাত, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও সংসদীয় শিষ্টাচার পালনের স্বার্থেই হয়তো ওই বিজেপি নেতারা সে ভয়াবহ সত্যটিকে উহ্য রেখেছেন। রাজ্যের যত্রতত্র দুধেলগাইদের আক্রমণ, ভারতীয় আইন ও নিয়মবদ্ধ আচরণবিধির প্রতি চরম অশ্রদ্ধার নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিক প্রদর্শন, রাজ্য জুড়ে অরাজকতার আবহ এবং অপরাধীদের উপর রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণহীনতা— সবই আদতে ভারতীয় সংবিধানকে ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁচকলা দেখানোর এবং এ রাজ্যে যে শাসনব্যবস্থাটি চলছে সেটি যে একটি মাওবাদী ব্যবস্থা যা কিনা ভারতরাষ্ট্রকে স্বীকার পর্যন্ত করে না, সেই বার্তা প্রদানের স্পষ্ট ভঙ্গিমা।

এমন সোজাসাপটা ও আক্রমণাত্মক দাবিগুলিকে অসার বুলিসর্বস্ব বলে যদি মনে হয়, তাহলে স্মরণ করা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসেছিলেন মেধা পাটেকর, অনুরাধা তলওয়ার, অরুন্ধতী রায় আদি মহা মহা সব 'শহুরে মাওবাদী' অ্যাক্টিভিস্ট, তাঁদের সহায়ক এনজিও এবং নানা ক্ষেত্রের নানা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যথা সাংবাদিক, শিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, আইএএস, আইপিএস, অ্যাডভোকেট, অভিনেতাদের সহায়তায়। ভুললে চলবে না একথাও যে, সে সময়ে মমতার সহায়ক হয়েছিল সিপিআইএম লিবারেশন, এসইউসিআই এবং আরও বহু মাওবাদী দল এবং ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একদা অর্থমন্ত্রী সিপিএমের অশোক মিত্র পর্যন্ত। অর্থাৎ সিঙ্গুর আন্দোলন যে আদতে ছিল 'শহুরে মাওবাদী'দের তরফে একখানি প্রাদেশিক স্তরের 'রেজিম চেঞ্জ' অপারেশন যার মুখ্য লাভার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের এই ঘোর দুর্দিনে সেই সরল সত্যটি সহজভাবে স্মরণ করার সময় আজ এসেছে। সিপিএমের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া 'শহুরে মাওবাদী'দের জন্য তখন হয়ে পড়েছিল জরুরি। কারণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য রাজ্যটিকে পুনর্শিল্পায়িত করার দিকে পা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন।

এহেন পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা যদি বিজেপির মতো একখানি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সে দলটি যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত প্রবৃদ্ধি তথা বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস করবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রুখতে এ রাজ্যে বিজেপির প্রতিষ্ঠা ঠেকানোর স্বার্থে 'শহুরে মাওবাদী'রা যে মরিয়া হয়ে যেকোনো প্রকার বিধ্বংসী পদক্ষেপই নিতে পারে তা অনুধাবন করতে সুবিধা কোথায়?

এতদিন পর্যন্ত শাসকাশ্রিত গুন্ডারা মেরেছে বুথ ও স্থানীয় স্তরের বিজেপি কার্যকর্তাদের। কিন্তু বিজেপির পক্ষে দাঁড়ালে যে কোনো আর্থ-সামাজিক স্তরের যে কোনো মানুষের পরিণতিই যে অকল্পনীয় ভয়ানক হতে পারে, রাজ্যের সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে সেই সন্ত্রাসের বার্তা দেওয়ার জন্য ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে তারা যদি বিজেপির নেতা ও নেতৃস্থানীয়দেরকে নিশানা বানায়, সেক্ষেত্রে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গেই আরও একবার স্মরণ করা প্রয়োজন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মহুয়া মৈত্রের সাম্প্রতিক আক্রমণাত্মক মন্তব্যটি যার মাধ্যমে মৈত্র প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ভারতের মাটিতে অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য মুণ্ডচ্ছেদ হওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরই। কারণ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উত্তরদায়িত্ব ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে 'শহুরে মাওবাদী'দের শেষ ভারতীয় দুর্গ হিসেবে রক্ষা করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বের যে কোনো স্তরের উপর হিংস্র আক্রমণ শাণাতে পশ্চিমবঙ্গের ইকোসিস্টেম যে ইতস্তত করবে না তা আগে থেকেই আন্দাজ করা আবশ্যক। ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন যদি ভারতের আর পাঁচটা রাজ্যের নির্বাচনের মতো করে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মাটির রক্তস্নাত হওয়ার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে প্রায় একশো শতাংশ। নির্বাচন কমিশন তা ঠেকাতে পারবে এমন আশার কুহকে আচ্ছন্ন হওয়ার কোনো কারণ পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য মানুষের নেই।

এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বকে দিয়েছেন কড়া বার্তা। তৃণমূলের তরফ থেকে আক্রমণ শাণানো হলেও বঙ্গবিজেপি নেতাদের তিনি দিয়েছেন বন্যার্তদের পাশে ত্রাণ নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ। আর এতেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইকোসিস্টেম পড়েছে কিছুটা বেকায়দায় যার ফলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এক পত্র যাতে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাজনীতীকরণ করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির নেতৃবৃন্দকে ফ্রন্ট ফুটে খেলার নির্দেশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমকে কিঞ্চিৎ ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কারণ প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এমন সরাসরি রুখে দাঁড়ানোর বার্তা যে আসতে পারে, পশ্চিমবঙ্গীয় ইকোসিস্টেম তা আন্দাজ করতে পারেনি।

'বন্যায় সব-হারানো মানুষেরা যখন দেখেছে যে চল্লিশটা গাড়ি হাঁকিয়ে একদল লোক তাঁদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে, তখন তারা হয়ে উঠেছে হঠাৎ-ক্ষিপ্ত'— ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর এহেন দাবিকে নস্যাৎ করে জানিয়েছেন যে মোট গাড়ির সংখ্যা ছিল কুড়িটি যার মধ্যে বারোটি ছিল মিডিয়া হাউসের গাড়ি, তথাপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত 'স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ'-এর এহেন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হতে পারত যদি না দেখা যেত যে নাগরাকাটার মানুষের কমিউনিটি ডেমোগ্রাফির সাংখ্যিক হিসাবটিই মুখ্যমন্ত্রীর হাইপোথিসিসের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী নাগরাকাটার জনগণের ১৪.২৬ শতাংশ ছিল তফশিলি জাতিভুক্ত, ৪৬.৬৭ শতাংশ তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ভোটার

তালিকা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১১.৭ শতাংশ। ডেমোগ্রাফির এই বিন্যাসই যদি ২০২৫-এও থেকে থাকে, তবে মুসলমানদের সেখানে প্রকৃত অর্থেই সংখ্যালঘু শক্তি হওয়ার কথা এবং বন্যার্ত মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কথা তফশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষদের। সেক্ষেত্রে জনরোষ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হতো, তবে তা তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের পক্ষ থেকে না এসে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এল কেন? এমন কয়েকটি প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই—

প্রশ্ন-১ : নাগরাকাটার রিলিজিয়াস জনবিন্যাস কি তবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে? নাকি খগেন মুর্মুর সংসদীয় ক্ষেত্র 'উত্তর মালদা'র জামাত-সমর্থিত কট্টরপন্থী ইসলামিয়রা 'উত্তর মালদা' থেকে উজিয়ে গিয়ে খগেন মুর্মুকে নিশানা করে আক্রমণ শাণিয়েছে নাগরাকাটায়?

আক্রমণকারীরা যেহেতু মুসলমান ছিল এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী যেহেতু সাধারণভাবেই প্রবল বিজেপি বিদ্বেষী, ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ' তত্ত্ব এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীতভাবে খাটবে না। কারণ বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের উপর নাগরাকাটার মুসলমানদের ক্রোধজনিত আক্রমণ যে বিজেপির প্রতি তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে নয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায়ই প্রকৃতপক্ষে নেই।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয় বিজেপি। আবার নাগরাকাটা বিধানসভা যে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি মোট ভোটের ৪৯.৯২ শতাংশ পেয়ে টিএমসি-কে ৭৫৪৪৭ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করলেও নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে টিএমসি-র কাছে পরাস্ত হয়েছে ১.৯৩ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। অথচ ২০১৯-এর লোকসভায় এই নাগরাকাটাই বিজেপিকে দিয়েছিল বিপুল ব্যবধানের জয়। পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে নাগরাকাটা বিধানসভা ক্ষেত্রে বিজেপির ফলাফল হয়েছে বিক্ষিপ্ত ও কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্নহীন। অথচ টিএমসি-র ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে একটি স্থির ও নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। ২০২৪-এর লোকসভায় নাগরাকাটার কয়েকটি বুথের ফলাফল এমন অসম্ভবরকম বিক্ষিপ্ত যে সেগুলি আদতে নাগরাকাটার জনবিন্যাসের পরিবর্তনের এবং নাগরাকাটায় বহু সংখ্যক কট্টর বিজেপিবিরোধী মানুষের সমাগমের প্রায় স্পষ্ট নির্দেশক।

প্রশ্ন-২ : নাগরাকাটার এই কট্টর বিজেপিবিরোধী মানুষেরা আদতে কারা? কিছু বুথে যারা প্রায় গোটা বুথ জুড়ে এককাট্টা হয়ে টিএমসি'কে ভোট দিয়েছে? *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

ভোটের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে নাগরাকাটা বিধানসভা বিজেপির শক্ত খাঁটি হয়ে উঠেছিল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই, অথচ ধীরে ধীরে তা বেরিয়ে যাচ্ছে বিজেপির হাত থেকে, হয়তো-বা নাগরাকাটায় কট্টর বিজেপিবিরোধী ভোটারের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলেই। ভোটের ফলাফলের এহেন ট্রেন্ডকে খগেন মুর্মুর আক্রমণকারীরা যে মুসলমান সেই সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে (correlation) তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো পূর্ণত যৌক্তিক যে নাগরাকাটার ক্রমবর্ধমান কট্টর বিজেপিবিরোধী ভোটাররা আদতে মুসলমান। এর মাধ্যমে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের উপরোক্ত ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

এ থেকে এ-ও প্রতীত হয় যে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের উপর আক্রমণ আদতে নাগরাকাটার মুসলমান ভোটারদের সাংখ্যিক শক্তি প্রদর্শনের একখানি নমুনা যা কিনা পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের সুরক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান ভোটারদের আচরণের এক সুপরিচিত হলমার্ক। অর্থাৎ সংখ্যার হিসেবে দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদ্বয়ের উপর হামলা আদতে 'স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ'জনিত নয় বরং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত। এ থেকে উপরোক্ত ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরও মেলে। খগেন মুর্মুর আক্রমণকারীরা উত্তর মালদা থেকে নাগরাগাটায় হয়তো আসেনি, বরং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে নাগরাকাটার রিলিজিয়াস জনবিন্যাসেরই।

সারণী

লোকসভা			বিধানসভা		
সাল	ভোট শতাংশ বিজেপি	ভোট শতাংশ টিএমসি	সাল	ভোট শতাংশ বিজেপি	ভোট শতাংশ টিএমসি
২০১৪	৩৫.৯%	২০.৬%	২০১১	০	০
২০১৯	৫৮.৪%	৩০.২%	২০১৬	২৭.১%	৩২.৫%
২০২৪	৪৩.৩%	৪৫.২৩%	২০২১	৪৯.৫%	৩৭.৩%

প্রশ্ন-৩ : ভারতের জাতীয় সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করা এহেন মুসলমানরা নাগরাকাটায় এসে জড়ো হচ্ছে কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর এখনোও জানা নেই যদিও নাগরাকাটার অবস্থান এমন এক স্থানে যে স্থান বাংলাদেশ সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এক্তিয়ারভুক্ত ৫০ কিলোমিটার এলাকার অব্যবহিত বাইরে। অর্থাৎ ভারতের এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের পর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যদি বিএসএফ-এর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার ঠিক বাইরে ঘাঁটি গাড়তে চায়, তবে নাগরাকাটা তার জন্য উপযুক্ত এক স্থান।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত হলেও নাগরাকাটার অবস্থান ভুটান সীমান্তের একেবারে লাগোয়া অঞ্চলে এবং ভুটান থেকে প্রবাহিত নদীগুলি নাগরাকাটার উপর দিয়ে বিপুল বেগে বয়ে গিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গকে। ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের মানুষকে শান্ত থাকতে অনুরোধ জানানোর সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, 'ওই জায়গাটি হলো বর্ডার'। এক্ষণে প্রশ্ন তৎসত্ত্বেও রয়েই যায় যে 'ওয়েস্টবেঙ্গল আন্ডার ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বর্ডার এরিয়াজ প্রোগ্রাম' (FMBAP)-কে

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১২৯০ কোটি টাকা অনুমোদন করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই খাতে সেই অর্থের ব্যবহার কতখানি বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে পেরেছে? পরিবেশ ও প্রকৃতিগতভাবে এতখানি সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং ভুটান থেকে প্রবাহিত নদীগুলির দ্বারা বিধ্বংসী বন্যার কবলে বার বার পড়া সত্ত্বেও উপযুক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ উত্তরবঙ্গে যেন শুরু করা হয়নি সে প্রশ্নও উঠবেই।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের পক্ষে এও জানানো হয়েছে, 'Under Ganga Action Plan and Namami Gange Project, a total of 62 projects and interventions worth Rs. 5,648.52 crore have been undertaken in the state of West Bengal. The National Mission for Clean Ganga (NMCG) has sanctioned a total of 31 sewerage infrastructure projects, 30 ghats and crematoria projects in the state. Besides, a large single project for river rejuvenation in West Bengal, the rejuvenation of Tolly Nullah in Kolkata has been sanctioned,'— প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন পরিকাঠামোর গঠনে এহেন অনুমোদিত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পেরেছে? উত্তর হলো— না, পারেনি।

কিছু রাস্তাঘাট ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কোনো প্রকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই অর্থব্যয় তেমন করেনি তার একমাত্র কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের অতিবাম শক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত বিকাশের প্রবল পরিপন্থী। তাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ, অপরাধমূলক অর্থব্যবস্থা ও জন কোষাগারের অর্থের সংগঠিত লুণ্ঠন এবং বাঙ্গালিমননের অবিরাম রাডিকালাইজেশন। তার জন্য এ রাজ্যের দরিদ্রায়ন অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের অপরাধ ছিল সম্ভবত এই যে বন্যার্ত মানুষকে বিনা শর্তে কিঞ্চিৎ সহায়তা প্রদান করতে তাঁরা গিয়েছিলেন। মমতা উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখার আগেই বিজেপির লোকেরা সেখানে পৌঁছে ইতিবাচক প্রচারের আলো নিজেদের উপর টেনে নেবেন, মমতা হয়তো তা চাননি।

দ্বিতীয়ত, খগেন মুর্মু নিজে তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধি এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতিপ্রধান নাগরাকাটার জন্য ত্রাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসন কৌশলটি হলো— রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নকল্পে অনেক বেশি বাজেট বরাদ্দ রাখা এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিভুক্তদের জন্য নিতান্ত কম আর্থিক বরাদ্দ রাখা। এহেন আর্থিক অসাম্যের মাধ্যমে তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি করা একজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তিক্ততা। মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের এই প্রকার বঞ্চনার মধ্যে ফেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে এমন সন্দেহ হওয়া অযৌক্তিক নয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হয়তো এহেন কৌশলের মাধ্যমে তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের আদতে ধর্মান্তরিত হওয়ার দিকে পরোক্ষে ঠেলে দিতে চায়। সেই কারণেই বুঝি খগেন মুর্মু আক্রান্ত হলেন একদল মুসলমান পুরুষ ও নারীর দ্বারা, কারণ তিনি নাগরাকাটার তফশিলিপ্রধান মানুষদের জন্য ত্রাণ নিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং স্থানীয় সংখ্যালঘুরা তা সহ্য করল না?

কট্টরপন্থী মুসলমানদের লেলিয়ে দেওয়া হলো তফশিলি উপজাতির একজন জনপ্রতিনিধির উপর, কারণ তিনি চেয়েছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে। এর প্রকৃত কারণ বোধ করি এই যে পশ্চিমবঙ্গের 'শহুরে মাওবাদী' ও 'জেহাদি মুসলমান'দের আঁতাতটি তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ভয় পায় এবং ভালো চোখে দেখে না। বিভিন্ন সময়ে এ রাজ্যের দলিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রকার আক্রমণ মুসলমানরা শাণিয়েছে এবং এহেন আক্রমণের যে রাক্ষুসে চেহারা রাজ্য জুড়ে দেখা গিয়েছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর, তাতে এই প্রকার ধারণাকে নস্যাৎ করা বস্তুত অসম্ভব।

নাগরাকাটার ঘটনার গতিপ্রকৃতি ও হামলার পর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সেখানে একা গিয়ে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টিকে দেখে সন্দেহ এও হয় যে খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর হামলা চালানোর জন্য নাগরাকাটার স্থানীয় মুসলমানরা মমতার অনুমতিটুকু নেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত হয়তো বা অনুভব করেনি, বরং কট্টরপন্থী মুসলমানরা বুঝি-বা হামলা চালিয়েছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই, কারণ রাজ্যের প্রশাসনিক সুরক্ষা যে তারা পাবেই সে বিষয়ে কোনো সংশয় তাদের ছিল না।

প্রশ্ন-৪ : যে কোনো পরিস্থিতিতে এই ধরনের কট্টর মুসলমানদের সুরক্ষা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদান করছেই-বা কেন? তবে কি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এদের বসবাসের বন্দোবস্ত করছে উক্ত স্থানের ভোটার তালিকাকে এমনভাবে পরিবর্তিত করার জন্য যাতে তৃণমূল নামক রাজনৈতিক দলটির নির্বাচনী বিজয় সুনিশ্চিত করা যায়? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর এখনোও পর্যন্ত অজানা।

এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের সন্ধানে প্রয়োজন সঠিক তদন্ত। নাগরাকাটার ঘটনার জন্য এনআইএ তদন্তের যে দাবি তোলা হয়েছে ও দায়ের করা হয়েছে জনস্বার্থ মামলা, তা ন্যায্য বলে মনে হয়। কারণ ভারতের জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এ ঘটনার প্রভাব থাকার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষত ঘটনার মূল অভিযুক্ত অপরাধীদের অধিকাংশকেই যেখানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি ১০ অক্টোবর পর্যন্তও। এমতাবস্থায় এনআইএ তদন্ত হয়তো সামনে নিয়ে আসবে চমকপ্রদ এমন কিছু তথ্য যা থেকে আমরা হয়তো পেয়ে যেতে পারব উপরোক্ত তিন ও চার নম্বর প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরও।

মন্বন্তর ও ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

'এসেছে বন্যা এসেছে মৃত্যু/পরে যুদ্ধের ঝড়/মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর/ প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস'— লিখেছিলেন সুকান্ত। গভীর যন্ত্রণা ও শঙ্কায়। পটভূমিতে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর। ১৯৪৩-এর ১৬ অক্টোবর প্রবল ঝড়ের ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী বঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার ফলে হলো মন্বন্তর। বাংলা ১৩৫০ সালে ঘটা এ মহা দুর্ভিক্ষ পঞ্চাশের মন্বন্তর নামেও পরিচিত। এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেদিনীপুর। আবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান হওয়ায় 'বঙ্গের হলদিঘাট' মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ইংরেজ প্রশাসন। ফলস্বরূপ বন্যা, অনাহার, অসুখে সারা বঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সরকার কালোবাজারি রুখতে ছিল অনিচ্ছুক। ত্রাণ পাঠানোরও ব্যবস্থা করেনি। যতটা সম্ভব মহামারীর নিদারুণ বিপর্যয়কে চেপে রাখার অপচেষ্টা দেখা দেয়। এই মন্বন্তর যতটা না প্রকৃতির দুন্দুভি নিনাদে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সরকারি অবহেলা, অসহযোগিতা ও মানবিক সত্তার অপমৃত্যুর জন্য হয়। ১৯৪৪-এর ২৩ সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যান-এ লেখা হলো—

"This sickening catastrophe is man-made so far as we are aware, all of India's previous famines originated primarily from calamities of nature. But this one is accounted for by no climines originated primarily from calmities of nature. But this one is accounted for by no climatic failure, rainfall has been generally plentiful... loss of impots from Burma is a big factor no doubt the rapid growth of population and sudden influx of very large number of men might have caused internal stresses but they are like a drop in the ocean... the largest factor has outstanding been a shameful lack of fore night and planning capacity of India's own civil govenment central provincial."

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত আক্রমণ করতে পারেন ভেবে ব্রিটিশ সরকার পোড়া মাটির নীতি নিয়ে অনেক জায়গায় ফসল পুড়িয়ে দেয়। নৌকা ও সাইকেল বাজেয়াপ্ত করে। প্রাদেশিক সরকারের প্রধান ফজলুল হক সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কংগ্রেসও ভাষণ দান আধ্যাত্মিক অসহযোগের নাটকে আবর্তিত হচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণি সংগ্রাম, পুঁজিবাদের নিপাতে যে মৌখিক আস্ফালন করছিল তার সামান্যতমও ত্রাণকাজে ব্যয় করেনি।

বঙ্গের এই চরম দুঃসময়ে এগিয়ে এসেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা স্বজাতির ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখতে যতটা ব্যস্ত ছিল গরিব মুসলমানের প্রতি তার কানাকড়িও ছিল না। এর পরও যেটুকু ত্রাণের ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকার করেছিল তার বেশিরভাগই মুসলমানদের জন্য। শ্যামাপ্রসাদ এ সময় অসহায়দের রক্ষা করতে ত্রাতার ভূমিকা নিলেন। গঠন করলেন বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। তিনি হিন্দু মহাসভার অবিংশবাদী নেতা হয়েও কোথাও এই সংগঠনের নাম ব্যবহার করেননি। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হলো— 'The only party that stood out to view and Thar the problem of famine on humanitarian ground and keep it beyond the preview of political gain was the Bengal Hindu Mahasabha in the person of Dr. Shyamaprasad Mukherjee.'

হিন্দু মহাসভা যখন সরাসরি ত্রাণকাজে হাত লাগিয়েছে তখন শুধু বেঙ্গল রিলিফ কমিটি কেন? জনমতকে সম্মান দিয়ে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির নাম পালটে হলো হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি।

ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে ত্রাণের জন্য লিগ মন্ত্রীসভা যেটুকু সাহায্য করছে তার সিংহভাগ মুসলমানদের জন্য। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। তাঁর মতো দূরদর্শী জননায়কের আহ্বানে সাড়া দিল গোটা দেশ। বিপুল ত্রাণ সামগ্রী এসে পৌঁছল। ১৯৪৪-এর ৩০ জুন পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার রিলিফ ফান্ডে জমা পড়ে ৮,৫৪,৬৪২ টাকা। চাল ও ডাল মিলিয়ে ৩৫,৬৭৬ মন সংগৃহীত হয়। প্রাপ্ত টাকার থেকে ৭,০৭,১৮৬ টাকা চাল ডাল কিনতে, ৭০,৪৩৪ টাকা কাপড় ও কম্বল কিনতে, ৯,৪৪০ টাকা সুতা কিনতে এবং বাকি ১৬০০০ টাকা ওষুধপত্র কিনতে ব্যয় হয়। ২৪ জেলার ২২৭টি ত্রাণ কেন্দ্র থেকে গড়ে প্রতিদিন ১,৯৭,৭২৭ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে সাহায্য দেওয়া হয়। এই ত্রাণকেন্দ্রগুলি থেকে ১৬,৬৪০টি ধুতি, ১০, ৫৮৩টি শাড়ী, ৩,৯২৪টি গেঞ্জি এবং ৯, ৭৮৯টি বাচ্চাদের পোশাক বিতরিত হয়। হিন্দু মহাসভা যখন এমন ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োজিত তখন মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বড্ড ব্যস্ত ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ নিজের ধর্ম, ঐতিহ্যকে তিলমাত্রও ভুলে যায়নি। দুর্ভিক্ষ যখন করাল রূপ নিয়েছে তখন অসহায় হিন্দু বালক-বালিকাদের ত্রাণ দেওয়ার নাম করে খাকসার পার্টি ধর্মান্তরণে ব্যস্ত হয়। ঠিক যেমন খ্রিস্টান মিশনারিরা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে করতে চায়। এই ধর্মান্তরণ স্বভাবতই মানুষকে উত্তেজিত করে। আবার প্রতিবাদী রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ভারত কেশরী। তাঁর প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কারণে সরকার খাকসার পার্টিকে ত্রাণ দিতে অস্বীকার করে।

দুর্গত পীড়িত মানুষদের একেবারে সামনে থেকে দেখেছেন শ্যামাপ্রসাদ। ত্রাণ দিয়েছেন সামনে দাঁড়িয়েই। বঙ্গের শাসনকর্তা জন হারবার্ট অসুস্থ হয়ে ছুটিতে গেলে স্যার টমাস রাদারফোর্ড কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭-এর ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে ড. মুখার্জী যে চিঠি দেন তাতে স্বাধীনতাপন্থী শ্যামাপ্রসাদকে পাওয়া যায়— 'আমাদের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না।'

এই সময় তিনি লেখেন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে বিখ্যাত বই। বই তো নয়, সম সময়ের প্রামাণ্য দলিল। ওই গ্রন্থের 'প্রতিকারের উপায়' রচনায় দুর্ভিক্ষ ও তার থেকে মুক্তি সম্পর্কে লেখেন--- 'পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাইতে হইলে রাজ্যের পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড এবং এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রে অবিলম্বে চাউল খাদ্যবস্তু পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্যই তো ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা এবং সেই কারণেই বঙ্গ আজ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছাইয়াছে।'

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের এক বড়ো অংশ কলকাতায় আসে একটু ভাতের ফ্যানের আশায়। অসহায় মানুষদের বেঁচে থাকার দাবিতে শ্যামাপ্রসাদ বিক্ষোভের আয়োজন করেন ১৯৪৪ সালের ২০ ও ২৪ সেপ্টেম্বর। এই বিক্ষোভের ফলে বৃহত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য জনমত গড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক মনোভাবও জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিকারের উপায়' প্রবন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বলেন— 'গভর্নমেন্টের তরফ হইতে আজ অবধি খুব যে বেশি কাজ হইয়াছে তাহা নয়। তবে এ লাভ লইয়াছে, সারা বিশ্বের কাছে কর্তৃপক্ষকে অবিরত জবাবদিহি করিতে হইতেছে। জনগণকে শাসন করিবার যাহারা দাবি রাখেন, জনগণের জীবন রক্ষার দায়িত্ব হইতে তাঁহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবেন না।'

মূলত শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টার কারণে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশন গঠনে বাধ্য হয়। ১৯৪৫-এর ১০ এপ্রিল কমিশন তার রিপোর্টে স্বীকার করতে বাধ্য হয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রতিকারে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিত্বের ও দূরদর্শিতার কারণে বঙ্গের অতি উজ্জ্বল এক নেতা। শ্যামাপ্রসাদের কথা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যান। তাঁর কথায় 'বঙ্গের নেতারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিটি বর্ণই সত্য। বঙ্গের এই নেতাদের মধ্যে তখন শ্যামাপ্রসাদ সর্বাগ্রগণ্য।'

শ্যামাপ্রসাদ পরবর্তীকালে হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষাক্ত কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা দিতে বামদলগুলোর প্রচেষ্টার শেষ নেই। অথচ শ্যামাপ্রসাদ মন্বন্তরের সময় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ত্রাণ দিয়েছিলেন। লিগ মন্ত্রীসভার মতো শুধু মুসলমান এলাকায় ত্রাণ বিলি করেননি। তাই লিগ মন্ত্রীসভাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ড. মুখার্জি না থাকলে বঙ্গের লক্ষ লক্ষ মুসলমান মন্বন্তরে মারা যেতেন। কমিউনিস্টরা লিগ মন্ত্রীসভার সঙ্গে সজোরে দাবি করতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে অভাব নেই এবং অবস্থা খুব শোচনীয় নয়। এমনকী বেসরকারি ত্রাণ কমিটিগুলি যাতে মুসলিম লিগের সাহায্য পুষ্ট কমিটির সঙ্গে ত্রাণ দিতে না পারে সেজন্যও কমিউনিস্টরা অতি সক্রিয় হয়। আসল লক্ষ্য ছিল শ্যামাপ্রসাদকে আটকানো। তাতে মন্বন্তরের শিকার হওয়া মানুষদের কিছু হলেও যায় আসে না।

কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সর্বভারতীয় নেতা। মন্বন্তরের সময় তাঁর সাহায্যের আবেদন গোটা দেশে অভূতপূর্ব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের রিপোর্টেও বলা হয় সে সময় কংগ্রেস 'did little' এবং হিন্দু মহাসভা 'did much'। আর ড. মুখার্জি সম্পর্কে শ্রদ্ধায় ব্যক্ত হয়— 'Dr. Shyamaprasad Mukherjee is perhaps the one man who is working for the relief of the distress without sparing himself the leant bit.

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত গৌরব। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি সবক্ষেত্রেই মানবিক ও দূরদর্শী ছিলেন বলে আক্ষরিক অর্থে হয়ে উঠেছিলেন 'ভারতকেশরী'। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এই ভারতকেশরী যে মানবিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পড়িত মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করে। শ্যামাপ্রসাদ সে সময় অসহায়দের শেষ আশ্রয়। তাঁদের বেঁচে থাকার ধ্রুবতারা। □

মুসলমানরা হিন্দু নাম ব্যবহার করছে কেন?

পিনাকী ভট্টাচার্য, অপু বিশ্বাস, দেব চৌধুরী, মুন্নী সাহা এরকম আরও অনেকে জীবন, যৌবন ও জীবিকার তাগিদে ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, ইসলামি নামও নিয়েছেন। এরকম যারা আছেন তারা দয়া করে আপনাদের পরিবর্তিত নামে পরিচিত হয়ে হিন্দুদের কিছুটা হলেও রক্ষা করুন। কেন বলছি একথা? এ সময়ে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি'র শিক্ষার্থী অপূর্ব পাল কোরান অবমাননার দায়ে ইউনিভার্সিটি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপূর্ব নাকি কোরানে লাথি মেরেছেন, এমন একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে এসেছে। এটি করা অন্যায় তা স্বীকার্য। হেফাজত ও অন্যান্য সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 'পাইছি' আর এক হিন্দু! সমস্যা এখানেই, অপূর্ব হিন্দু নন।

দু' বছর আগে (২০২৩) এক মুসলমান তরুণীর প্রেমে পড়ে অপূর্ব ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। এখন তার নাম অপূর্ব আহমদ রাদ। বাংলাদেশে মিডিয়া সব জানে, কিন্তু সুড়সুড়ি দিয়ে 'অপূর্ব পাল' লিখে যাচ্ছে। এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র ফেরদৌস রহমান ফরিদ কোরান পোড়ানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাংলাদেশে ইসলামের অবমাননার ভুয়া অভিযোগ তুলে ২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বহু হিন্দুদের সর্বস্বান্ত করা হয়েছে, বাড়িঘর পুড়েছে, নিহত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে, জেল খেটেছে, অনেকে এখনো জেলে, কেউ-বা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলাম ও নবির অবমাননা শুনলে হিন্দুরা ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি বাড়িঘর পুড়লো? তাই বলছিলাম, হিন্দু নাম ছাড়েন, আরবি নামে পরিচিত হন।

প্রশ্ন জাগে, কেন শুধু ইসলাম অবমাননা হয়? শুনেছেন কি কখনো যে, বাইবেল বা গীতা বা ত্রিপিটক অবমাননার দায়ে কোনো মুসলমান গ্রেপ্তার হয়েছে? শোনেননি, তবে কি মুসলমানরা হিন্দুধর্মের এবং অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতির অবমাননা করে না? ওয়াজ শুনলে বুঝবেন। কোরানের অবমাননা অমুসলমানরা ততটা করে না, মুসলমানরাই করে! বায়তুল মোকাররমে হেফাজতের কোরান পোড়ানোর ঘটনা তো সবার জানা। কুমিল্লায় দেবী দুর্গার চরণে কোরান রেখেছিল ইকবাল। আসলে কোরান বা নবির অবমাননার অধিকাংশ ঘটনা ভুয়া, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য একটি মহল তা ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাংলাদেশে ইসলাম ও নবির অবমাননার নামে অন্য ধর্মের মানুষকে হয়রানি করাটা বন্ধ হওয়াটা দরকার।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

মুখ্যমন্ত্রী কখনোই সত্য কথা বলতে পারেন না

যে মুখ্যমন্ত্রী দেবীপক্ষের শুরুতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জিএসটি কমিয়ে দেওয়ার এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ জিএসটি থেকে ০ শতাংশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নিজে নিতে চান, ভাবটা এমন যেন তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী। নিজের কোলে ঝোল টানতে তিনি খুব ভালো পারেন। অবশ্যই এতে যদি কোনো মেডেল থাকতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সোনার মেডেল পেতেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্য একটা দিকের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

তৃণমূলের সরকার দেখে ও তাদের বড়ো, মেজ, সেজো ও ছোটো নেতাদের বিলাস ও বৈভব দেখে মানুষ মনে করে রাজনৈতিক জগতে সবাই চোর। যে সমস্ত তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা নিজে বাজারের থলি নিয়ে দৈনিক বাজারে যান আর যাই হোক সাধারণ মানুষ তাদের নিয়ে না বুঝেই উপহাস করে। খুব কম মানুষ তাদের সততার জন্য প্রশংসা করে। এই ভাবেই দুর্নীতির সঙ্গে মানুষ না বুঝেই দুর্নীতির সমর্থক হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই নিজের সামান্য সুবিধার জন্য দুর্নীতির আশ্রয়দাতা ও সমর্থক হয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা পুকুর চুরি করে চলেছে।

রাজনৈতিক জগতের সবাই অসাধু নয়। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল বিধায়করা দামি পোশাক ও দামি গাড়ি চড়ে ঘোরাফেরা করে। এরা ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মতোই চরম নির্লজ্জ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন কোনো মতে বাড়াতে রাজি নয়। তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীদের বিছানার নীচে পাওয়া যায় কোটি কোটি টাকা। তাদের পেনশন না পেলেও চলবে। সুকৌশলে রাজনীতিকে কলুষিত করে চলেছে তৃণমূল নেতারা।

তাই বলি জিএসটি হ্রাসের কৃতিত্ব অন্যায় ভাবে নিজে না নিয়ে ক্ষমতা থাকলে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের জেলে ভরুন মুখ্যমন্ত্রী।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যই বাঁচাতে পারে বাঙ্গালি হিন্দুর অবশিষ্ট মাটি

যারা আজ 'সেটিং তত্ত্ব' নিয়ে ভাবছেন, তাদের বলি— একবার চোখ খুলে দেখুন এসআইআর ইস্যুতে বাম, তৃণমূল, কংগ্রেস— তিন দলের অবস্থান কি আলাদা? না, একটাও না। যদি নাম-পরিচয় লুকিয়ে দেওয়া হয়, আপনি বুঝতেই পারবেন না— কে তৃণমূল, কে বাম, আর কে কংগ্রেস। শুধু এই এসআইআর নয়, আজ দেশের ৯৯.৯৯ শতাংশ বিষয়ে এই তিন দল একই সুরে গাইছে, একই ভঙ্গিতে চলছে। কেন্দ্রের বিরোধী দলনেতা বিদেশ থেকে তৈরি করা ভুয়ো তথ্যের উপর ভর করে একটা প্রোগ্রাম করেছিল।

ফঃ ৩

তার সেই সাজানো অনুষ্ঠানে সিপিএমের জেনারেল সেক্রেটারি এমএ বেবি আর অভিষেক ব্যানার্জি— পাশে পাশে বসে সেই ভুয়ো প্রেজেন্টেশন দেখেছিল! আর চারদিকে উল্লাস! বামেরা, তৃণমূলেরা হাততালি দিচ্ছিল— 'কী কাজটাই না করে ফেলেছে!' কিন্তু পরে যখন দেখা গেল, ভিডিয়োর একটার পর একটা তথ্য মিথ্যা, প্রোপাগান্ডা, তখন সবার মুখে তালা। একটা লজ্জাবোধও জাগল না কারও মধ্যে!

দু'বছর আগের কথা মনে আছে? যখন ইডি, সিবিআই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাচ্ছিল, তখন এই বাম, তৃণমূল, কংগ্রেস— একজোট হয়ে মনুসিংভির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিল। চেয়েছিল, ইডি-সিবিআইয়ের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হোক, কোনো চোর, অপরাধীকে যেন কেউ ধরতে না পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই ষড়যন্ত্রের মুখে আইনি চপেটাঘাত করেছিল।

আরও মজার ব্যাপার কী জানেন? একদিকে তারা ইডি-সিবিআইয়ের কাজ আটকাতে মরিয়া, অন্যদিকে এখানকার তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' আর বামপন্থী মুখপাত্ররা চিৎকার করছে— 'সেটিং আছে, সেটিং আছে।' এই হচ্ছে আসল দ্বিচারিতা, এই হচ্ছে সাজানো নাটক! ভেবে দেখুন, বাম আর তৃণমূল— এরা আজ একই আত্মা, দুই শরীরে। দেশের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তারা একসঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধিতা করছে, একসঙ্গে ভোট দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, একসঙ্গে সংসদে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। আর রাজ্যে এসে বলে— 'সেটিং'! কী ভয়ানক ভণ্ডামি এটা!

তাই বলছি, আবেগে ভেসে যাবেন না। ওই 'বাম ইকোসিস্টেম' খুব চতুর, তারা জানে কীভাবে সরলমনা স্বদেশপ্রেমীদের মধ্যে বিভাজন ছড়াতে হয়। ওরা জাতীয়তাবাদী সেজে, মিথ্যা গল্প ফেঁদে আমাদের ভিতরেই সন্দেহ ছড়াচ্ছে। মনে রাখবেন, বাম আর তৃণমূল নীতির দিক থেকে একেবারে অভিন্ন। তৃণমূল যে বামদের নীতি কপি করেছে, সেই কপি করা নীতিটাই আজ আরও বিষাক্ত, আরও ভয়ংকর। কারণ যারা এই ধ্বংসাত্মক নীতি 'অ্যাডপ্ট' করে, তারা বামেদের থেকেও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই দুই বিষাক্ত শক্তির উদ্দেশ্য একটাই— জাতীয়তাবাদী সমাজের ভিত ফাটানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো।

তাই, সাবধান হোন। ওদের কুচক্রে পা দেবেন না। চোখ খুলে দেখুন— কে সত্যি দেশের জন্য, আর কে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে নাটক করছে। এই সময় আমাদের জাতীয়তাবাদীদের এক থাকতে হবে। কারণ এদের মিলিত বিষ থেকে দেশকে বাঁচাতে পারবে কেবল ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিই।

—**সৌরভ চক্রবর্তী,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও রাজনীতি

১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিনে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রেশিমবাগে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কিছু বালক স্বয়ংসেবক নিয়ে শুরু করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ও কার্যকর্তা নির্মাণ করা দরকার। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শাখা, মিলন, মণ্ডলীর মাধ্যমে ব্যক্তি নির্মাণ করে থাকে যারা ব্যক্তি সমাজ ও দেশের হিতে কাজ করবেন। আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত হয়েছে সঙ্ঘ। আজ সঙ্ঘ ১০০ বছর পূর্ণ করেছে। ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেননি। ব্যক্তি নির্মাণ, সমাজ ও দেশ গঠনের জন্য তিনি উপযুক্ত কার্যকর্তা নির্মাণের জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডাক্তারজীর পরে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক হলেন মাধব সদাশিব রাও গোলওয়ালকর বা শ্রীগুরুজী। গান্ধীজী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় স্বয়ংসেবকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়, জেলে রাখা হয়। পরে অবশ্য সঙ্ঘ নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ভাবনা, সমাজের ভাবনা পার্লামেন্টে বলার জন্য জনপ্রতিনিধির প্রয়োজন অনুভব হয়।

তাই ওই সময়ে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০-৮২ সাল নাগাদ ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী সঙ্ঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকরা কখনো সরাসরি রাজনীতি করতে পারবেন না। তাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলে সঙ্ঘের কোনো দায়িত্বও পালন করেন না। কোনো উপযুক্ত কার্যকর্তা নির্মাণ হলে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ, দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতেও পারেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দীনদয়াল উপাধ্যায় থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাওয়ার পরে কোনো সঙ্ঘের কোনো দায়িত্বে থাকেননি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর সঙ্ঘের কোনো দায়িত্ব নেই। তাই সঙ্ঘ আর রাজনীতির পরিপূরক সম্পর্ক থাকলেও সঙ্ঘ কিন্তু কখনও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সঙ্ঘের বহু স্বয়ংসেবক রয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নতুন নতুন অনেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন এবং স্বয়ংসেবক হওয়ার ভান করছেন, যা একেবারেই কাম্য নয়। শাখা, মিলন, মণ্ডলীর মাধ্যমে কার্যকর্তা নির্মাণ, ব্যক্তির সংস্কার, অনুভব, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলেই ব্যক্তি সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারবেন। তাই সমাজের পরিবর্তনের জন্য ও দেশের কল্যাণে সঙ্ঘ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সঙ্ঘের দায়িত্বশীল কার্যকর্তাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া উচিত। যারা সঙ্ঘকে প্ল্যাটফর্ম করে ভোটের রাজনীতিতে স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়, তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়। যারা মানুষের আবেগ, বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে তাদের কখনো ভোটের রাজনীতিতে সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমাজের পরিবর্তনের জন্য এবং দেশের হিতে গত একশো বছর ধরে কাজ করে চলেছে। পরম বৈভবশালী দেশ গড়তে করতে হলে সুযোগসন্ধানী, তথাকথিত স্বয়ংসেবকের ভান করা জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত হবে না।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

একটিমাত্র সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত কি যুক্তিসঙ্গত?

তনুশ্রী নাগ দাশ

বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষ্যানুসারে বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই পবিত্র বিবাহ-রীতির প্রচলন। শাস্ত্রমতে বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একমাত্র পুত্রসন্তানের দ্বারাই সম্ভব। কারণ বিবাহের পর কন্যা গোত্রান্তরিতা হবার ফলে কন্যা বংশের ধারা বজায় রাখতে পারে না। যদিও যুগধর্মের কারণে সব ক্ষেত্রে শাস্ত্রের এই অমোঘ সত্যকে সর্বক্ষেত্রে মান্যতা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। একটি মাত্র সন্তান গ্রহণে বিশ্বাসী দম্পতিরা তাঁদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে বেশ কিছু যুক্তির অবতারণা করতেই পারেন। কিন্তু তাঁদের ভেবে দেখা উচিত—

এক, বাবা-মা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁরা তাদের সন্তানের সর্বাত্মক সাহচর্য কামনা করেন। কিন্তু যাঁদের একটি মাত্র সন্তান তাঁরা কি আশা করতে পারেন যে, তাঁদের অন্তিম মুহূর্তে তাঁদের সন্তান তাঁদের পাশে থাকবে, কর্মসূত্রে দূরে যাবে না, বিপথগামী হবে না এবং বেঁচে থাকবেই?

দুই, প্রতিটি দম্পত্তিরই তাঁদের সন্তানদের ঘিরে থাকে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। সবাই চান তাঁদের সন্তান লেখাপড়া, গান-বাজনা, খেলাধুলা, আঁকা, সাঁতার ইত্যাদিতে সেরা হোক। কিন্তু যাঁদের একটি মাত্র সন্তান, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি কিন্তু সেই সন্তানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। ফলে সেই সন্তানের শৈশব, বাল্য, কৈশোর বলে আর কিছু থাকে না। মাতা-পিতার আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষার নিগড়ে বাঁধা পড়ে সে হাঁপিয়ে উঠে। ফলে অনেকে মানসিক রোগের শিকার হয়, কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

তিন, বাবা-মা'র একমাত্র সন্তানেরা একটু বড়ো হলেই কিন্তু বুঝতে পারে যে, একমাত্র সে ছাড়া তার বাবা-মায়ের আর কেউ নেই। সুতরাং সে যখন যা চাইবে মা-বাবা তাই দিতে বাধ্য। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের চাহিদার তো অন্ত নেই। ফলে কিছু না পেলেই সৃষ্টি হয় জেদ। সে তো কখনো কাউকে কিছু দিতে শেখেনি। ভাগ করেও খেতে শেখেনি। শিখেছে শুধু নিতে। ফলে স্বার্থপরতা তার মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আর উঠতে বসতে সে শুনেছে মা-বাবার একটাই উপদেশ— 'তোমাকে কেরিয়ারিস্ট হতে হবে।' ফলে সেই সন্তানেরা ভবিষ্যতে টাকা রোজগারের মেশিন তৈরি হলেও তাদের কত শতাংশ দেশের ও দশের উপকারে আসে তা প্রায় সকলেরই জানা।

চার, দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য তো অনেক অতন্দ্রপ্রহরী প্রয়োজন। কিন্তু কত শতাংশ এক সন্তানের বাবা-মারা তাঁদের একমাত্র নয়নের মণিকে সেনাবাহিনীতে পাঠাতে রাজি থকেন? আর এভাবে যদি দেশের ৮০/৯০ ভাগ হিন্দু দম্পতি একটিমাত্র সন্তান গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী হন, তাহলে দেশের অতন্দ্রপ্রহরী সৈনিক কারা হবেন? অবশ্যই অহিন্দুরা। হিন্দুদের সংখ্যা যদি এভাবে ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানরাই হবে দেশের সামরিক কর্মী, তখন দেশটা ভারত থাকবে তো?

পাঁচ, প্রতি দম্পতির একটি মাত্র সন্তান গ্রহণের প্রবণতা যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে হিন্দু কুলোদ্ভব শিশুরা ভাই-বোন, দাদা-দিদি, কাকা-কাকিমা, জেঠিমা-জ্যাঠামশায়, মামা-মামিমা, পিসি-পিসেমশায় ইত্যাদি মধুর সম্বোধনগুলি থেকে বঞ্চিত হবে না?

ছয়, পরিণত বয়সে পৌঁছাবার আগেই দুর্ভাগ্যবশত কোনো এক সন্তান বিশিষ্ট দম্পত্তি যদি তাঁদের একমাত্র নয়নের মণিকে রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সেই শিশু বা কিশোরের পরিণতি কী হবে? তাকে তো আশ্রয় দেবার মতো এ বিশ্ব-সংসারে কেউ কোথায়ও থাকবে না।

পরিশেষে চলমান প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা— আমরা নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির নীড় গড়তে গিয়ে সেই অনিবার্য পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি না তো? আমরা কখনো ভেবে দেখেছি কি ঝঞ্ঝাটমুক্ত শান্তির নীড় গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা আমাদের একমাত্র নয়নের মণিকে কূলকিনারা-বিহীন একাকিত্বের আবর্তে নিক্ষেপ করছি না কি? সে তার পরিণত বয়সে পৌঁছবার আগে আমরা ইহলোক ত্যাগ করবো না— এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? তাই এহেন সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের নামান্তর বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। □

শিশুর জন্মকাল থেকে বিপাকীয় সমস্যা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

জন্মগত মেটাবলিক রোগসমূহ বংশগতভাবে বাহিত হয়। এতে নবজাতক বা শিশুর দেহে এক বা একাধিক একজাইমের ঘাটতি বা কাজের অস্বাভাবিকতার কারণে প্রোটিন সংশ্লেষ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কোনো দেহবর্জ্য ক্রমশ দেহে জমা হতে থাকে এবং পরবর্তী ধাপের উপাদানটি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। ক্ষতিকারক উপাদানের পরিমাণ দেহে বাড়তে থাকে। প্রধানত জিনের মিউটেশনের কারণে এই সমস্যা ঘটে। মিউটেশন জিনের একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের নিয়ন্ত্রক অংশটিতে ঘটলে ওই এনজাইম এবং তার কো-এনজাইম বা কো-ফ্যাক্টর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে তথ্য প্রবাহকারী প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংবেদনশীল সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

পৃথিবীতে কমপক্ষে তিনশো জন্মগত মেটাবলিক রোগ শনাক্ত হয়েছে। দিনে দিনে আরও এই ধরনের নতুন রোগ শনাক্ত হচ্ছে। এই দলভুক্ত অনেক রোগ শনাক্ত হওয়ার বাইরে আছে। বিভিন্ন দেশের প্রায় পাঁচ হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই দলভুক্ত রোগগুলোর একেকটির প্রাবল্য একেক রকম। যেমন— ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া প্রতি পাঁচশো জীবিত নবজাতকের একজনের থাকতে পারে। ফিনাইল কিটোনরিয়া বারো হাজারে একজনের থাকতে পারে। অর্গানিক এসিডোইউরিয়া পনেরো হাজারে একজনের থাকতে পারে। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিড ষাট হাজারে একজনের। গ্যালাকটোসেমিয়া পঁয়তাল্লিশ হাজারে একজনের, হমোসিস্টোনরিয়া এক লক্ষের মধ্যে একজন এবং ম্যাপলসিরাপ ইউরিনডিজি দু' লক্ষ নব্বই হাজার নবজাতকের মাঝে একজনের থাকতে পারে।

এই জিনগত ত্রুটিসমূহ অটোসোমাল রিসেসিভ ট্রেইট হিসেবে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষে বাহিত হয়। কোনো একজনের দেহে এই রোগ থাকলে পরবর্তী চারটি সন্তানের একজনের (২৫ শতাংশ) আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি থাকবে। এই দলভুক্ত কিছু রোগ এক্স-লিঙ্কড্ যেখানে মাতা বাহক, পুরুষদের ৫০ শতাংশ স্বাভাবিক অথবা রোগাক্রান্ত। মাইটোকন্ড্রিয়াল রোগগুলি যাদের আছে তাদের সবকটি (১০০ শতাংশ) সন্তানই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগকে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়— ক্যাটাগরি ১-এর রোগসমূহে আক্রান্ত ব্যক্তির এনজাইমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। ক্যাটাগরি ৩-এ দলভুক্ত রোগসমূহে মেটাবলিক পাথওয়ে আক্রান্ত হয়। ক্যাটাগরি ২-এর রোগসমূহকে আবার ১, ২, ৩ এভাবে ভাগ করা হয়।

এই রোগগুলোর শারীরিক লক্ষণ নবজাত শিশু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিণত বয়সেও দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট বিপাকীয় লক্ষণসমূহ দেখা দিতে পারে। যেমন— শিশুর খাদ্য গ্রহণে অনীহা, ঘন ঘন বমি হওয়া, জলশূন্যতা, দুর্বল বোধ করা, মাংসপেশি থলথলে বা শক্তিহীন মনে হওয়া ও খিঁচুনি। কোনো কোনো শিশুর শরীরে ইনফেকশনেও এই রকম দেখা দেয়। এই দলভুক্ত শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো জীবাণু সংক্রমণ। তবে কিছু কিছু শিশুর তীব্র শ্বাসকষ্ট হতেও দেখা যায়। কিছু কিছু নবজাতক এই রোগগুলোর লক্ষণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যদিও ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে তা শনাক্ত হতে সময় লাগতে পারে।

এই রোগগুলোকে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে নবজাতকদের স্ক্রিনিং টেস্ট করার কোনো বিকল্প নেই। এতে যাদের রোগ ধরা পড়বে তাদের চিকিৎসা দিতে হবে এবং ভালো ফলাফল সেক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে। পরিণত বয়সে বা পরে কোনো এক সময় এই রোগগুলো ধরা পড়লে চিকিৎসার পরও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত সন্তান ধারণকারিণী মা'রও বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন— ফিনাইল কিটোনরিয়ায় আক্রান্ত মাকে সন্তান গর্ভে থাকাকালীন খাদ্যাভ্যাসে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হয়।

গ্লাইকোজেন স্টোরিজডিজিজ রোগীদের অসিদ্ধ ভুট্টার শর্করা যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া যায়। মেটাবলিক ত্রুটি সাপেক্ষে শৈশবে বা কৈশোরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন— প্রোপাইওনিয়া এসিডেমিয়ায় আক্রান্ত পরিণত বয়সিদের হাত-পা কাঁপে এবং ক্রমশ স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে। যাদের ফ্রুকটোজ জাতীয় খাদ্য হজমে এনজাইমের ত্রুটি থাকবে তারা ফ্রুকটোজ জাতীয় খাবার খেলে মারাত্মক বিপাক জনিত সমস্যায় পড়বেন। এনিমিয়া বিপাক জনিত সমস্যার রোগীরা সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন এবং ঘন ঘন আইসিইউতে নিতে হতে পারে।

শৈশব বা কৈশোরে কিছু কিছু রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন--- এলক্যাপটোনরিয়ায় আক্রান্তদের বড়ো বড়ো জয়েন্টগুলোতে ও মেরুদণ্ডে ব্যথা শুরু হয় ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের পর। হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজ বেশি কমে যাওয়া) পরে যে রোগগুলো সেগুলো সাধারণত শৈশবেই প্রতিভাত হয়। যেসব শিশু-কিশোর অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়ে, তাদেরও এই দলভুক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। ইউলসনডিজিজ কৈশোরে বা প্রাপ্তবয়সেই দেখা দেয়। রোগ শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা করা হয়। যা রোগীর লক্ষণ, পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। এই রোগগুলো অনেক সময়ই অগোচরে থেকে যায় আর যখন তীব্র লক্ষণ দেখা দেয়, তখন রোগ শনাক্তকরণের চেষ্টা করা হয়।

এর মধ্যেই হয়তো অনেকটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাই, সম্ভব হলে প্রতিটি শিশুর জন্মগত মেটাবলিক রোগের স্ক্রিনিং করা উচিত। এই রোগগুলোর পরীক্ষা সমূহের মধ্যে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারও কারও আল্ট্রাসনোগ্রাম, এক্সরে, সিটিস্ক্যান, এমআরআই এবং বিশেষ জেনেটিক টেস্ট করা দরকার হতে। টেস্টগুলো বিশেষ ধরনের হলেও আমাদের রাজ্যে এখন তা সম্ভব। ◻

বিপর্যয়ের মধ্যে মানবিক উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রাণ ও সেবাকার্য

মানস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৫ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যা ও ধস-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ব্যাপক ত্রাণ ও সেবাকাজ শুরু করেন। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা দিনরাত কাজ করছেন— উদ্ধার, চিকিৎসা, খাদ্য ও পানীয় জলের সরবরাহ, আশ্রয় শিবিরে ত্রাণ বিতরণ— সব ক্ষেত্রেই তাঁরা সক্রিয়ভাবে এখনোও যুক্ত রয়েছেন। সঙ্ঘের সূত্রে জানা গেছে, ৭ অক্টোবর দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রায় ১৮০টি গ্রামে সেবাকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৫ হাজারেরও বেশি দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে স্বয়ংসেবকরা বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে চাল ১০ কুইন্টাল, আটা ৮ কুইন্টাল, ডাল ৫ কুইন্টাল, ত্রিপল ১,০০০টি, ম্যাগি ১০,০০০ প্যাকেট, বিস্কুট ১০০ প্যাকেট, কম্বল ৫০০টি, ব্লিচিং পাউডার ১০০ কেজি এবং রান্নার সরঞ্জাম সেট ৫০টি। এছাড়া স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হয়েছে মুড়ি, চিড়া, গুড়, দুধগুঁড়ো ও শিশুখাদ্য। জরুরি ওষুধ সংগ্রহ করা হয়েছে স্থানীয় চিকিৎসক এবং ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সদস্যদের সহযোগিতায়। স্বয়ংসেবকরা যে ক্ষেত্রগুলিতে সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে রয়েছে দুর্গত মানুষ, গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীর উদ্ধার, শুকনো খাবার ও রান্না করা খাদ্য বিতরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, ত্রিপল, কম্বল ও পোশাক

বিতরণ এবং রান্নার সরঞ্জাম সরবরাহ।

এই সেবাকাজে প্রায় ১,০০০ জন স্বয়ংসেবক সরাসরি অংশ নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ২০০ জন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা-সহ অন্যান্য মাতৃমণ্ডলী এবং প্রায় ৩,০০০ জন সজ্জন শক্তি (সহযোগী নাগরিক)— যারা সক্রিয়ভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এই ত্রাণ কার্যের নেতৃত্বে রয়েছে উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী, যারা সমগ্র অভিযানের সমন্বয় করছে। সঙ্ঘের পাশাপাশি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বজরং দল, দুর্গা বাহিনী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, সেবিকা সমিতি ও ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সদস্যরাও সমানভাবে সেবার কাজে যুক্ত রয়েছেন। ৫ অক্টোবর দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন ডাঙ্গুজোত গ্রাম থেকে এই সেবাকাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে জনজাতি অধ্যুষিত ও চা-বাগান এলাকায়, বিশেষ করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, স্বয়ংসেবকরা উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বর্তমানে বামনডাঙা-সহ চা-বাগান অধ্যুষিত জনজাতি অঞ্চল এবং পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেই সেবার কাজ চলছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বাল্মীকি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ‘সামাজিক সমরসতা অভিযান’ দ্বারা বাল্মীকি জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। গত ৪ অক্টোবর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী মানিকচন্দ্র পাল, সহ-প্রান্ত সমরসতা প্রমুখ সুনীল শর্মা। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা ছিলেন কলকাতা ক্ষেত্রের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার। বিজয়া দশমীর তাৎপর্য, মহর্ষি বাল্মীকির জীবনী এবং সামাজিক সমরসতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তিনি বিস্তারিতভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে ভেদাভেদহীন, সমরস সমাজ নির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য।

এছাড়াও মধ্যবঙ্গের আসালসোল জেলার জামুড়িয়া, বহরমপুর, উত্তরবঙ্গের মালদহ, ঈশ্বরপুর-সহ অনেক স্থানে এবছর ‘বাল্মীকি জয়ন্তী’ উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০টি স্থানে ১ মাস আগে দুর্গাপূজা ও বাল্মীকি জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যানার টাঙানো হয়। রাজ্যের সর্বত্র বাল্মীকি সমাজের লোকজনের প্রতি বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

কাঁথিতে ভারতীয় রাজ্য পেনশনার্স মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত কার্যকারিণী বৈঠক

গত ১২ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় রাজ্য পেনশনার্স মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত কার্যকারিণী বৈঠক। সংগঠনের প্রান্ত স্তরের সকল কার্যকর্তা-সহ মোট ৩০ জন সদস্য এই বৈঠকে যোগ দেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য বিশ্বজিৎ বসুর কণ্ঠে ‘জয় ভারতী বন্দে ভারতী’ গানটির মধ্য দিয়ে এদিনের বৈঠকের সূচনা হয়। সংগঠনের প্রান্ত সভাপতি শঙ্কর পাহাড়ীর কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিনের বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বনগাঁ নগরের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে শুরু হয় বুক স্টল। স্টলটির উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলা প্রচারক তপন মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন অজয় ঘোষ, নীহার মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অভ্র ঘোষ, জগন্নাথ মণ্ডল-সহ বহু স্বয়ংসেবক।

সমাজ সেবা ভারতী ও বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন

গত ৫ অক্টোবর সমাজ সেবা ভারতী ও বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা-হাওড়া সেবা বস্তি বিকাশ সমূহের মিলিত আয়োজনে কলকাতা রাজস্থান বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো এক অভূতপূর্ব সামাজিক মিলন পর্ব। এই দিনটি শুধু একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের স্মৃতি নয়, বরং সমাজের অন্তঃস্থলে জাগিয়ে তুলল মানবিকতা, সেবাব্রত, সংস্কার ও সংগঠনের মহত্ত্ব। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'বিজয়া সম্মিলনী, ২০২৫। অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠল এক অসাধারণ মানবিক চেতনার উন্মেষস্থল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী, বিশেষ অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তন নির্দেশক অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, হাওড়া মহানগর সঙ্ঘচালক সঞ্জয় কুমার বসু এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত কুমার সিংহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ-সহ সঙ্ঘের অন্যান্য কার্যকর্তা।

আনন্দঘন, উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে মাতৃমণ্ডলীর অতিথি অভ্যর্থনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান তাঁরা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের যে ভাবগম্ভীর সূচনা হয়, তা ছিল একদিকে যেমন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, তেমনই অন্যদিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথে যাত্রার লক্ষ্যে এক দৃঢ় প্রত্যয়।

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা রায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীত শ্রোতাদের অন্তরে এক অপূর্ব আবেগের জোয়ার বইয়ে দেয়। এরপর মাতৃমণ্ডলী পরিবেশিত গীতি-আলোচনা অনুষ্ঠানস্থলে ছড়িয়ে দেয় সুর, সাধনা ও সেবার এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সমাজসেবায় জড়িত চারজন নিবেদিতপ্রাণ সেবাব্রতী তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মজীবনের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কাহিনি শোনান, যা উপস্থিত দর্শকদের মনে গভীর অনুপ্রেরণা জাগায়।

স্বাগত ভাষণে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী বলেন, 'সমাজ সেবা ভারতী গত দু'দশক ধরে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবং সমাজের প্রয়োজনে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের প্রতিটি সেবা বস্তিতে বসবাসকারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজ সেবা ভারতী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন সমাজ সেবা ভারতী ও বনবন্ধু পরিষদ গৃহীত একটি নতুন প্রকল্পের কথা, যা কলকাতা ও হাওড়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত। এই প্রকল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা ও স্বাবলম্বনের চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে। এই প্রকল্পে 'শিক্ষা'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে— শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা, সান্ধ্য বিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টার। 'স্বাস্থ্য পরিষেবা'য় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে— বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, মা ও শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা। 'সামাজিক সচেতনতা'র অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো--- মাদকবিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা। 'স্বাবলম্বন'-এর অন্তর্গত বিষয় হলো— সেলাই, হ্যান্ডিক্রাফট্, ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎসাহদান এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত কুমার সিংহ বলেন, 'সেবা কেবল বাহ্যিক সাহায্য নয়, এটি অন্তরের এক জাগরণ। জাতীয় পুনর্গঠন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষদের পাশে আমরা নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়াই— শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও মূল্যবোধ নিয়ে।'

জলধর মাহাতো তাঁর প্রেরণাময় বক্তব্যে বলেন, 'সঙ্ঘের কাছে 'সেবা' কেবল একটি কর্মসূচি নয়, এটি জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তরুণ সমাজকে এই সেবাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে— সেবা শুধুমাত্র দান নয়, বরং সময়, শ্রম, মমতা, ভালোবাসা দিয়েই সকলকে সমাজ গঠনে অবদান রাখতে হবে।' শান্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী ট্রাস্টের উদ্যোগে বস্ত্রদান

মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী ট্রাস্টের উদ্যোগে ও সহায়তায় যমুনাবালী সারদা বিদ্যামন্দিরে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে সমাজের কয়েকজন দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পূজার আগে নতুন বস্ত্র পেয়ে তাঁরা খুবই খুশি হন। ট্রাস্টের সভাপতি মৃগাঙ্কশেখর মাইতি জানান যে, এই ধরনের বিবিধ সামাজিক কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে এই ট্রাস্ট। যেমন— স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, রক্তদান এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে এককালীন অর্থপ্রদান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সম্পাদক সুহাস রঞ্জন পাত্র, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, নিখিল সমাদ্দার ও সুব্রত চৌধুরী। বিদ্যালয়ের সম্পাদক পূর্ণেন্দু মাজী, সহ-সভাপতি শান্তনু দত্ত এবং প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ ভট্টাচার্য এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী দিনগুলিতে সমবেত প্রচেষ্টায় এই ধরনের কাজের আরও বিস্তৃতি তাঁরা কামনা করেন।

মায়াপুরে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত অধিবেশন

গত ১৩ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলায় মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙা শাখার অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, সীমা জাগরণ মঞ্চ সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংযোজক শ্রীমুরলীধরজী এবং সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সংগঠন মন্ত্রী গণেশ পাল। অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি তাপস কুমার বিশ্বাস। তিনি বলেন যে, বিএসএফ এবং সীমান্তবর্তী নাগরিকদের একসঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ করে যেতে হবে, তা না হলে সমূহ বিপদ। পূজনীয় মহারাজ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের সীমান্ত সমস্যা এবং তাঁদের করণীয় কাজ সম্পর্কে কার্যকর্তাদের অবহিত করেন এবং দেশরক্ষায় সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দিশানির্দেশ করেন। শ্রীমুরলীধরজী সংগঠনের বর্তমান এবং আগামীদিনের রূপরেখার বিষয়ে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। এছাড়াও এই অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ প্রচারক সুদীপ সিংহ, মুর্শিদাবাদ বিভাগ কার্যবাহ সুব্রত মণ্ডল, নদীয়া বিভাগ কার্যবাহ অরিন্দম বালা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

ফঃ ৪

মালদহে পর্যাবরণ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

মালদহ অরবিন্দ পার্ক শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো পর্যাবরণ সংরক্ষণের বিশেষ মাতৃশক্তি জাগরণ এবং পরিবেশ রক্ষার সংকল্প বিষয়ক কর্মশালা। এই কর্মশালায় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন পর্যাবরণ সংরক্ষণের অখিল ভারতীয় সংযোজক গোপাল আর্য এবং অখিল ভারতীয় শিক্ষণ সংস্থানের প্রমুখ ড. অনিল কুমার। গোপালজী বলেন, শিক্ষিত মা হলেন সন্তানের প্রথম গুরু, তাই পরিবেশ রক্ষা করতে হলে সর্বপ্রথম মায়েদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজন। আগামী প্রজন্ম যদি পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে না আসে, তারা যদি জৈব চাষ, প্লাস্টিক বর্জন, জল সংরক্ষণের ওপর জোর না দেয়, তাহলে প্রতি পাঁচজনে দু'জন ক্যানসার আক্রান্ত আমাদের দেশে পাওয়া যাবে। জল, মাটি, জঙ্গল, পশুপাখি ও মানুষ--- এই ৫টি উপাদানের ভারসাম্য থাকলে তবেই আমরা সুরক্ষিত থাকব। ড. অনিলজী বলেন, মানুষ একমাত্র প্রাণী যারা পরিবেশ দূষণের কারণ। তাই পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সকলকে সংকল্পগ্রহণ করে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। কর্মশালায় উপস্থিত যোগ প্রশিক্ষক তথা প্রধান অতিথি তপন দাশ বলেন, আমরা যোগব্যায়াম করে আমাদের শরীর-মন ঠিক করতে পারি, কিন্তু প্রাণায়াম থেকে শুরু করে শ্বাসক্রিয়াতে যে বায়ু আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে, সেটা যদি বিষযুক্ত হয়, চাল, ডাল থেকে শুরু করে যে শাকসব্জি, ফল খাবার হিসেবে আমরা গ্রহণ করব সেই সমস্ত কিছু যদি বিষাক্ত রাসায়নিক যুক্ত হয়, তাহলে সেটি গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল দেওয়ার মতো ব্যাপার হবে। তাই যাঁরা শ্বাস নেন, যাঁরা জল ও খাবার খান সেই সমস্ত মানুষকে পরিবেশ রক্ষার কথা ভাবতে হবে। কর্মশালায় উপস্থিত কার্যকর্তা, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী বিপ্লব থোকদার বলেন, তাঁরা তাঁদের গ্রামকে আদর্শ পরিবেশযুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মিত বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে জৈব কৃষি বিষয়ক কর্মশালা করে চলেছেন। উত্তর মালদহের কার্যকর্তা জীবন মণ্ডল বলেন, এই কর্মশালাতে অনেক কিছু শিখেছি। সরকার বা পৌরসভা কী করছে না দেখে নিজেদের জীবনশৈলীতে ছোটো ছোটো পরিবর্তন করলেই পরিবেশ সংরক্ষণের ৮০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে। মালদহের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক নারায়ণ মণ্ডল বলেন ইকো ব্রিকস্ অর্থাৎ প্লাস্টিকের বোতলে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক, যেমন— ক্যারিব্যাগ, বিস্কুট, চকোলেটের প্যাকেটগুলো ভরে জমা করলে এবং নিজেদের বাড়িতে, স্কুলে ডিম ও সবজির খোসা এগুলো থেকে কম্পোস্ট বানালে পরিবেশ অনেক অংশে কম দূষিত হবে। পর্যাবরণ সংরক্ষণের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, আমরা যেমন ২৮ দিন পরপর ফোনের রিচার্জ করতে ভুলি না, তেমনই যদি আমরা সতর্কভাবে আমাদের বাড়ির ব্যবহৃত জল, বৃষ্টির জল এগুলি মাটির ভিতরে না ফিরিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ না করতে পারি, তবে আগামীদিনে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। আমরা খুব আশাবাদী যে, মানুষ নিজের ভুল অবশ্যই বুঝবে আর আমাদের এই কর্মসূচিতে আরও বেশি করে যোগদান করে নিজেদের পরিবর্তন করবে। এর ফলে প্রকৃতির ক্ষতিসাধনও কম হবে।

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে মহাউদ্ধারণ মঠে সাহিত্য সভার আয়োজন

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে গত ৪ অক্টোবর মহানাম সম্প্রদায়ের মানিকতলা-স্থিত মহাউদ্ধারণ মঠে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর মহারাজের আশ্রমে 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' ও 'স্বদেশী বার্তা' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাউদ্ধারণ মঠের সম্পাদক বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, প্রণব কন্যা সঙ্ঘের আত্মস্থানন্দময়ী মাতাজী, স্বদেশী বার্তা সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পত্রিকা সম্পাদক সৈকত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সোমনাথ সরকার, মহিষাদল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. উৎপল কুমার উখাসনী, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া, দেশের মাটি গোষ্ঠীর উপদেষ্টা ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। সভার শুরুতেই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রমিতি রায়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সন্ন্যাসিনী আত্মস্থানন্দময়ী মাতাজী।

এদিনের সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বরূপানন্দময়ী মাতাজী ও ভজনানন্দময়ী মাতাজী। সংগীত পরিবেশন করেন ছন্দা হালদার ও রূপালী বর্মণ। সভা সঞ্চালনা করেন মিলন খামারিয়া। সভার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ব মেদিনীপুরের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গৌতম বর্মণ। শান্তি মন্ত্র পাঠ করেন যোগ প্রশিক্ষক রূপা চক্রবর্তী।

হাওড়া মন্দিরতলায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ প্রবন্ধকারিণী বৈঠক

গত ১১ অক্টোবর হাওড়া জেলার মন্দিরতলায় আইনজীবী দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সভাগৃহে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত হলো 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)'-এর 'প্রদেশ প্রবন্ধকারিণী বৈঠক'। বৈঠকে সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু, রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ তথা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক অধিকারী বিপ্লব রায় এবং প্রদেশের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

সভার শুরুতেই ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন কার্যকর্তারা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগীত টোলীর সদস্যা পারমিতা নিয়োগী। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত চলা এই বৈঠকে সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রমের পরিকল্পনাও করা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে আজ এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরায় বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই আমরা। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি কত উচ্চমানের তা বিশ্ববাসী জানুক।

এই সভার আয়োজক ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার কার্যকর্তারা। দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীত টোলীর সদস্যা অনিমা দাসও এই সভায় সংগীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রান্তের সাহিত্য বিধা প্রমুখ সঙ্ঘমিত্রা কবিরাজ।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে 'হিজলী দিবস' স্মরণ

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী কারাগারে বন্দি, নিরস্ত্র দেশপ্রেমিকদের ওপর প্রথমে বেয়নেট চার্জ করা হয়। এরপর গুলি চালিয়ে একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সীমাহীন নিষ্ঠুরতার এই ঘটনা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আপামর ভারতবাসীর মনে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করে। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে দুই বাঙ্গালি যুবক সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত প্রাণ দেন। এই দিনটি 'হিজলী দিবস' হিসেবে স্মরণ করা হয়।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত স্মৃতি সমিতি এবং চট্টগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার লাফিং ক্লাবের সহযোগিতায় এই দু'জন বিপ্লবীর আত্মবলিদান দিবস স্মরণ করা হয়। স্থানীয় ৫০ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা সজল ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বিপ্লবীদের জীবনাদর্শের কথা তুলে ধরেন। বিপ্লবীদের মূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিপ্লবী পরিবারের সদস্য পরিতোষ সেন, কৌশিক দত্তগুপ্ত, তরুণ বিশ্বাস, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, ব্যারাকপুর নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি সত্যব্রত সোম-সহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। এদিনের স্মরণ অনুষ্ঠানের বক্তারা সকলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশান ও বাবুবাগানেও এদিন 'হিজলী দিবস' স্মরণ করা হয়।

কলকাতা মধ্যভাগের শ্রদ্ধানন্দ নগরের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে এবার দুর্গাপূজায় সূর্যসেন স্ট্রিটে একটি পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়। বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল এবং পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। বিপণন কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন রাকেশ সাহানি, জয়নারায়ণ সিংহ, কুন্তল দাস, কার্তিক সাউ, আশিস দাস ও অভিজিৎ বিশ্বাস।

মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গারই অপর নাম

মা জগদ্ধাত্রী

শেখর সেনগুপ্ত

মা আমাদের একজনই। ত্রিভুবনের কল্যাণেই তিনি তিনবার ত্রিমূর্তি ধারণ করেন এবং সামগ্রিকভাবে জীবজগৎকে পরিপূর্ণ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনিই মা দুর্গা, তিনিই মা কালী এবং তিনিই মা জগদ্ধাত্রী। মহিষাসুরকে বধ করবার পরবর্তীকালে মানব সমাজকে ন্যায় ও দয়ার আবহে টেনে আনবার জন্য সেই মা-ই জগদ্ধাত্রীর রূপ পরিগ্রহ করেন। মহিষাসুর বধের পরও জগৎ থেকে অনাচার, অত্যাচার দূর না হবার কারণে মায়ের পুনরায় আবির্ভাব। সেই লগ্নে মা কী রূপে আগমন করেন, তাঁর কাব্যিক বর্ণনা আমরা পাই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জগদ্ধাত্রী বর্ণনায় :

সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং
নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং
নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।।
শঙ্খশার্ঙ্গ
সমাযুক্ত—বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাশ্চং ধারয়ন্তীঞ্চ
দক্ষিণ।।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং
বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুণিগণৈঃ সেবিতাং
ভবসুন্দরীম্।।

বঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। বলপূর্বক টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় নবাব আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। পরে বিজয়াদশমীর দিন অপ্রত্যাশিত মুক্তি পেয়ে তিনি যখন নৌকাযোগে নবদ্বীপ ফিরছিলেন, ভাবাবস্থায় দেখতে পান মাতা জগদ্ধাত্রীকে। মা বলছেন, 'ঠিক একমাস পর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে আমাকে জগদ্ধাত্রীরূপে পূজা করবি। তুই তোর সম্মান, মান্যতা ও ক্ষমতা সবই ফিরে পাবি।'

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মায়ের সেই নির্দেশ পালন করেন এবং বঙ্গের ইতিহাসে বিবিধ কৃতিত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গারই অপর একটি নাম জগদ্ধাত্রী। তিনিই শ্রীবিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিনী মা চণ্ডী। কার্তিক মাসের শুক্ল নবমীতে তাঁর পূজা। সেখানে তিনি দশভুজার বদলে চতুর্ভুজা। মহিষাসুর নেই। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পরিবর্তে রয়েছেন জয়া আর বিজয়া। কার্তিক-গণেশও অনুপস্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, স্বদেশ জননীর তিনটি রূপ। জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ভারতমাতা, দুর্গা শত্রুদলনী জননী এবং মা কালী পরাধীনতার কালে সর্বরিক্তা ভারতমাতা। দেবীর বাহন সিংহের পায়ের কাছে আছে একটি হস্তিমুণ্ড। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'-এ উল্লেখ আছে, '...চণ্ডীর মধ্যেও দেবী জগদ্ধাত্রীর বিশ্বরূপের পরিচয় আমরা পাই। দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবী কর্তৃক নিহত হলে স্বর্গের সকল দেব-দেবী একত্রিত হয়ে মা জগদ্ধাত্রীকে এই ভাষায় নিজেদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে জ্ঞাপন করেন—

'আধারভূতা জগৎস্তমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।' অর্থাৎ আপনিই হলেন সেই দেবী, যিনি যুগে যুগে একাই ইহজগতের আশ্রয়স্বরূপা। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) তাঁর রাজধানী কৃষ্ণনগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার বিশাল আয়োজন করেন। তদনুযায়ী প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়ে আসছে। যিনি দুর্গা, তিনিই জগদ্ধাত্রী।

প্রাচীন ব্যাবিলনের প্রতিটি নগরে একজন করে নগরপালিকা দেবীরূপে পূজ্যা ছিলেন। প্রত্যেক দেবীর রূপবর্ণনায় আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় মাতা জগদ্ধাত্রীর। আদতে বিশ্বে মাতৃরূপিণী দেবী একজনই। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁর পরিচিতি। এক দেবী দুর্গারই কত নাম! কাত্যায়নী, অপর্ণা, কৌশিকী ইত্যাদি। আদিতে হিন্দুরা কেবল মাতৃসাধনাই করতেন। শিবের আগমন অনেক পরে। দুর্গার অন্যতম নাম যে কাত্যায়নী, তার কারণ দূর অতীতে কাত্য নামক জনজাতিদের দ্বারা তিনি পূজিতা হলেন। কুশিক নরগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা হতেন বলেই দুর্গার আর এক নাম কৌশিকী। আবার অসুরকে দলন করে জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা এনছিলেন বলেই তিনি জদদ্ধাত্রী।

প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসেও অনুরূপ এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। নাম তাঁর ডিবন। এই দেবী আমাদের মা কালীর মতো একাধারে যেমন স্নেহময়ী, অন্যদিকে অপরাধীদের প্রতি ততটাই খড়্গহস্ত। বিশ্বের প্রাচীন সভ্য দেশগুলির অন্যতম ভারতবর্ষ মাতৃসাধনার একটি শক্তপোক্ত স্থান। এখানে প্রকৃত মাতৃশক্তির আরাধনা চলে। মিথ্যা ও চালবাজি এখানে ঘোরতর অপরাধরূপে চিহ্নিত। স্বয়ং ব্রহ্মা এহেন দেবীর প্রতি এই স্তব উচ্চারণ করেছেন—

ত্বং স্বহা ত্বং স্বধা ত্বং হি
কষটকারঃ স্বরাস্থিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা
মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।

ভারতে শক্তিসাধনার ইতিহাস

(দ্বিতীয় পর্ব)

ড. অনিমেষ চক্রবর্তী

গৌড়ীয় তন্ত্র, কাশ্মীরি তন্ত্র, কেরলীয় তন্ত্র— তিন তন্ত্রেই দেবীপূজা সম্পর্কে খুব কম পার্থক্য আছে।

গৌড়ীয় তন্ত্র—এঁরা গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করেন। দেবতা ও গুরুমন্ত্রের চৈতন্যকে তেজপুঞ্জনিভ ভাববেন। সেখানে আয়ুধহাতে দেবী মহামায়া বিরাজ করছেন। দেবী সর্বরূপা। এভাবে সাধক দেবীকে পূজা করেন ও দেবীকৃপা লাভ করেন। এই পূজায় সর্বার্থসিদ্ধি সঙ্কল্প করে (আবাহন, স্বাগতম) পুষ্পার্পণ করার পর নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়। তারপর হোম, তাম্বুল নিবেদন ও বলিদান। এঁরা বাম হাতে পূজা আর ডান হাতে তর্পণ করেন এবং মুখ্য পঞ্চ-মকার গ্রহণ করেন, তারপর নিজ হৃদয়ে দেবীর বিসর্জন করেন। বঙ্গের কালীকুলের শক্তিসাধকরা সাধারণত অদ্বৈতবাদী।

দক্ষিণ ভারতীয় তন্ত্র বা কেরালা তন্ত্র—এখানে তিন সম্প্রদায়, তাদের প্রতিটির আবার তিনটি ভাগ। শিব, শক্তি, শিবশক্তি এইরকম প্রত্যেক ভাগের শুদ্ধ, উগ্র ও গুপ্ত তিনটি করে ভাগ। ইষ্টদেবতা অনুসারে এরকম ভাগ। দ্রাবিড়ীয় বা দক্ষিণদেশীয় তন্ত্রসাধনায় শ্রীবিদ্যারূপী ত্রিপুরসুন্দরী বা ষোড়শী কামেশ্বরীই পূজিতা । দ্রাবিড়ীয় তন্ত্রে শিব স্বীকৃত এবং ত্রিপুরসুন্দরীর সঙ্গে অবিনাভাবে সম্পৃক্ত। এই তামিলীয় শৈবদর্শন স্বীকার করে যে, শিবের পঞ্চমুখের প্রতিটি থেকে পাঁচটি আগমের সৃষ্টি। ওই মোট আঠাশটি আগম থেকেই শিবজ্ঞান শাস্ত্রগুলির বিকাশ হয়েছে। এখানে সিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়, বীরশৈব সম্প্রদায় প্রভৃতি আছে। আচার্য বসব প্রতিষ্ঠিত বীরশৈব সম্প্রদায়ই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় বলে পরিচিত। দ্রাবিড়ীয় তন্ত্রসাধনার উপাস্যদেবী ত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতা বা ষোড়শী। বিভিন্নভাবে এই দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর সাধনার কথা আছে।

কাশ্মীরি তন্ত্র—কাশ্মীরি তন্ত্রে পীঠার্চনার পর বলিদান করতে হয় আর পঞ্চোপচারে পূজার পর করতে হয় হোম। এঁরা পঞ্চ ম-কারের পরিবর্ত হিসেবে অনুকল্প ব্যবহার করেন। সাধক নিজের বাম উরুর উপরে রক্তচন্দন দিয়ে শক্তি ত্রিকোণ এঁকে তাতে শক্তিবীজ লিখে, পূজা করে শতবার শক্তি গায়ত্রী জপ করবেন। স্বয়ম্ভুকুসুমের অভাবে রক্তচন্দন দিয়ে অর্ঘ্য দিবেন। কাশ্মীরি সম্প্রদায়ের সাধকেরা স্বীয় সহস্রারে দেবতার বিসর্জন করবেন।

মন্ত্র দেবতা ও গুরুর ঐক্য ভাবনা করে অক্ষরের স্বরূপকে তেজপুঞ্জের মতো কল্পনা করবেন। ইষ্টসিদ্ধিপ্রত মন্ত্র জপ এবং চৈতন্যত্রিতয় অর্থাৎ গুরুমন্ত্র দেবতার অক্ষরে অবস্থান ভাবনা করবেন।

তন্ত্রে সাধারণত সাত রকমের আচারের উল্লেখ আছে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তচার ও কৌলাচার। এছাড়াও সময়াচার আছে। কুলার্ণব তন্ত্রে ও সর্বোল্লাসতন্ত্রে, গৌড়বঙ্গের অন্যান্য তন্ত্রে এর উল্লেখ আছে।

মহামায়া মহাদেবীর আনন্দরূপ। নানা বর্ণ ও আকারের নানা সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত এইসব রূপের বর্ণনা করা অতি দুরূহ। সদাশিব দেবীকে বলেছেন—তুমি সর্বশক্তিস্বরূপা, সর্বদেবময়ী তনু। তুমি স্থুল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত অব্যক্তরূপিনী। তুমি নিরাকারা, তুমি সাকারা।

দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে একটি লোকরঞ্জক কাহিনি সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত আছে। মহাভাগবত পুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে যে আবির্ভাব কাহিনি পাওয়া যায়, তাতে সতী পিতা দক্ষের যজ্ঞে যাবার জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এদিকে দক্ষ সকল দেব দেবীকেই আমন্ত্রণ করেছেন একমাত্র শিব ও সতী ছাড়া। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিব সতীকে বারণ করেন।

কিন্তু সতী যাবার জন্য জিদ করতে থাকেন। তখন শিব তাঁকে বলেন—দক্ষকন্যে, আমি জানি তুমি আমার কথার বাধ্য নও, আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা কীসের, তোমার যা ইচ্ছে করো।

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবী ভাবেন, আমাকে পত্নীরূপে লাভ করে শিব আমার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন। অতএব নিজলীলায় সকলকে ত্যাগ করে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করব। এই ভেবে দেবী মহামায়া অতি ভয়ংকরী কালীমূর্তি ধারণ করলেন। দিগম্বরী আলুলায়িতকুন্তলা মুণ্ডমালিনী লোলজিহ্বা কৃষ্ণাঞ্জন সমপ্রভা সেই মূর্তি দেখে শিব ভয়ে পালাতে চাইলেন এবং দিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেন। তখন দেবী ক্ষণমধ্যে দশমূর্তি ধারণ করে দশদিকে অবস্থান করেন। শিব সবদিকে ভয়ংকরী মূর্তি দেখে চোখ বন্ধ করেন এবং চোখ খুলে আবার কালীমূর্তি দর্শন করেন। শিব জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি শ্যামা, আমার সতী কোথায়? মহাদেবী বললেন আমিই সতী, সৃষ্টিসংহারকারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। তোমার বনিতা হবার জন্য গৌরবর্ণা হয়েছিলাম। দশদিকের দশ মহাভয়ংকরী দশমূর্তি সকল আমারাই মূর্তি।

চামুণ্ডাতন্ত্র অনুসারে মহাবিদ্যা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা, এই দশমহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়। বিভিন্ন দেবতার আবির্ভাব কাল বিভিন্ন সময়। কালীর আবির্ভাবকাল মহারাত্রি, তারার আবির্ভাবকাল

ক্রোধরাত্রি, ষোড়শীর দিব্যরাত্রি, ভুবনেশ্বরীর সিদ্ধরাত্রি, ছিন্নমস্তার বীররাত্রি, ভৈরবীর কালরাত্রি, ধূমাবতীর দারুণরাত্রি, বগলামুখীর বীররাত্রি, মাতঙ্গীর মোহরাত্রি এবং কমলার মহারাত্রি।

একই রকমভাবে দেবীদের নামের সঙ্গে বিদ্যার সম্পর্কও বিভিন্ন রকম। যেমন কালী মহাবিদ্যা, তারা শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরী সিদ্ধবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী সিদ্ধবিদ্যা, ছিন্নমস্তা বিদ্যা, ভৈরবী বা ত্রিপুরভৈরবী সিদ্ধবিদ্যা, ধূমাবতী বা অলক্ষ্মীবিদ্যা, বগলামুখী বা বল্‌গামুখ সিদ্ধবিদ্যা, মাতঙ্গী বিদ্যা, কমলা বা লক্ষ্মী বিদ্যা।

দেবীদের সাধনসঙ্গী শিবের নামেও পার্থক্য আছে। দেবী কালীর শিব মহাকাল, দেবী তারার শিব অক্ষোভ্য, দেবী ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরীর শিব ত্র্যম্বক, দেবী ছিন্নমস্তার শিব কবন্ধ, দেবী ভৈরবী বা ত্রিপুরভৈরবীর শিব দক্ষিণামূর্তি কালভৈরব, দেবী বগলামুখী বা বল্‌গামুখীর শিব একবক্ত্রশিব, দেবী মাতঙ্গীর শিব মতঙ্গ, দেবী কমলার শিব সদাশিব বিষ্ণু।

তিথি-নক্ষত্রের বিচারে আবার বিভিন্ন রাত্রিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। দারুণরাত্রি, দিব্যরাত্রি, বীররাত্রি, মহারাত্রি, ক্রোধরাত্রি, ঘোররাত্রি, তারারাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, কালরাত্রি। কালরাত্রি কালী ও তারার প্রিয়করী।

এই সকল দেবী সদাসর্বদা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ত্রিভুবনে এইসব দেবীর মতো আর নেই। একবার মাত্র দশমহাবিদ্যার উচ্চারণে জীব সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। দশমহাবিদ্যার উচ্চারণে স্মরণ ও মননের দ্বারা মানুষের ভবপাপ মুক্ত হয়ে যায়।

মহাকাল ও মহাকালীই হলেন শিব ও শক্তি। বিভিন্ন দেবতার ধ্যান, ধারণা, পূজা, আচার যন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন, তবে সকল কিছু ভিন্নতার মধ্যেও একতা বা অদ্বৈত বা শাক্তদ্বৈতের ভাব নিহিত থাকে। এই শক্তি বিশিষ্ট অদ্বৈতত্ত্বে একমাত্র অহংতারই প্রকাশ থাকে, আবার অহংরূপ অহন্তা থেকে ইদম্ বা ইনন্তার আবির্ভাব হয় এবং শাক্তদর্শন এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

কালকে গ্রাস করেন বলে তিনি কালী। সৃষ্টিকালে সমগ্র বিশ্বের তিনি আদিরূপিনী এবং সংহারকালে সমগ্র বিশ্ব তিনি কলন করেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবতা কালিকা থেকেই উৎপন্ন আবার কালীতেই লয়প্রাপ্ত হয়। মহাকালসংহিতা বচনের, কর্পূরাদিস্তোত্রে বলা হয়েছে কালী ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদ্যা কালিকা নির্গুণাচিৎস্বরূপিনী, তিনি অমিতাকার শক্তিস্বরূপা, অচিন্তনীয়া। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র অধিষ্ঠান, গুণাতীতা, দেবীপরব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

বঙ্গদেশের তন্ত্রে আদ্যাশক্তি কালীই প্রধান দেবী। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র অনুসারে, হাদিমতে মহাশক্তিকে কেরালায় কালী, কাশ্মীরে ত্রিপুরা এবং গৌড়ে তারা বলা হয়। অন্যদিকে কাদিমতে কেরালায় দেবীকে ত্রিপুরা, কাশ্মীরে তারিণী এবং গৌড়ে কালী বলা হয়। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে দক্ষিণ দিকে যমের অবস্থান, কালী নামে ভীত হয়ে সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছোটে। তাই দেবী দক্ষিণাকালী।

শক্তিপূজা বৈদিককালেও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে বোঝা যায় বৈদিককালে শক্তিসাধনা বর্ধিত হয়েছিল। দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা, অগ্নিদুর্গা এবং আরও নানা দেবীর উল্লেখ আছে।

ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা যায়।

সৃষ্টি যখন ছিল না, তখনও মহাশক্তি কালী ছিলেন। মহাকালীর এই রূপ তত্ত্বপূর্ণ। মুণ্ডমালার নরমুণ্ড মাতৃকাবর্ণ অ, আ, ইত্যাদি স্বরবর্ণ থেকে ক, খ, গ, ঘ পঞ্চাশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এইসব মাতৃকাবর্ণই চৈতন্যময় শব্দব্রহ্ম।

দেবী কালিকার জিহ্বা বহির্ভাগে প্রসারিত। জিহ্বা বর্ণোচ্চারণের যন্ত্র। এই জিহ্বাই বৈখরী নাদ বা বর্ণ। তিনি বর্ণে বর্ণে নাম ধরেন। বিশ্বরূপিনী জননীর বর্ণ প্রতীক জিহ্বা বাইরের দিকে প্রসারিত-বৈখরী। সকল বৈখরীবর্ণ (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ) মহাশক্তি কালীর রূপ। দেবী কালিকার গলায় মুণ্ডমালা আসলে বর্ণমালা এবং তা থেকে রুধির বিগলিত। এই রুধির ধারা আসলে অমৃতধারা। মহাকালের বুকে মরণকে জয় করে লীলা করেন দেবী। লীলা অর্থে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম। তন্ত্রমতে নিত্যেরই লীলা বলে নিত্য ও লীলা দুটিই সত্য। তাই তন্ত্রমতে কালী ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই কালী। (আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি— রামপ্রসাদ সেন)।

মানুষের ভাব সাধারণত দিব্য, বীর ও পশু—এই তিনভাগে বিভক্ত। সাধকের নিজস্বভাব অনুযায়ী তন্ত্রসাধনায় বিভিন্ন প্রকার আচার অনুষ্ঠান ও পদ্ধতিরীতির কল্পনা করা হয়।

কালী কুণ্ডলিনীর স্বরূপ। কুণ্ডলীশক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশিতা। এই তিনটি শক্তি তেজোদীপ্ত। আধারপদ্মবাসিনী কালী কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্য বিচ্ছুরিত শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, তখনই তা কামেশ্বরী বা কামকলা বা পরানাদ শ্রীবিদ্যা। কলা বিচ্ছুরিত সচঞ্চলা প্রকৃতি বা কারণ, আর অবিচ্ছুরিত স্বরূপাস্থিত শক্তি বিন্দু মহাকারণ। তাই প্রকৃত অর্থে কুল অর্থে কালী, সুতরাং কুলকুণ্ডলীকৃতা শক্তিই স্বরূপে আদ্যাশক্তি কালী।

দেবী কালিকা দিগম্বরী ও মুক্তকেশী। তিন মায়াতীত এই মায়াই সূক্ষ্ম আবরণ। দেবী পূর্ণ ব্রহ্মময়ী। দেবী চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি (ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্না) এই তিন নিত্য নয়নের দ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিত্য নিয়মিত প্রত্যক্ষ করেন। দেবী চতুর্ভুজা—দেবী কালিকা চতুর্ভুজা। ডানদিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা, নীচের হাতে বরমুদ্রা। বামদিকের উপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড। দেবী চতুর্ভুজ কারণ, প্রতিটি ভুজের মাঝের অংশ নব্বই ডিগ্রি, এভাবে চতুর্ভুজ তিনশত ষাট ডিগ্রিতে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ। এই বৃত্ত পূর্ণরূপ। দেবী পূর্ণরূপা। দেবী পূর্ণব্রহ্ম।

বর্ণময়ী দেবী সরস্বতী সকল ভাব ও বর্ণের স্রষ্টা। এই বর্ণ থেকে সিদ্ধবীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি থেকে হয় বোধ, জ্ঞান, ক্রিয়া (হ্রীঁ, ক্রীঁ, শ্রীঁ, ঐঁ, ক্লীঁ)। তন্ত্রে মন্ত্রসমূহ শব্দব্রহ্মেরই বাহ্যরূপ, তা আবার আ-কার উ-কার, ম-কার, কলা, বিন্দু, নাদ, শক্তি, শান্ত —এই আটটি মাত্রাভেদে বিন্যস্ত।

শব্দব্রহ্মদেবী ওঙ্কার ও শব্দব্রহ্মরূপিনী কুণ্ডলিনী থেকে শক্তির বিকাশ হয়। শক্তি থেকে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে নাদ, নাদ থেকে নিরোধিকা, নিরোধিকা থেকে অর্ধেন্দু, অর্ধেন্দু থেকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা প্রভৃতি বাক্ বা ধ্বনির বিকাশ হয়।

মহাশক্তি শিবরূপী শববক্ষস্থিতা দক্ষিণাকালী শিবের তথা মহাকালের উপর উপবিষ্টা, মহাকালের নীচে সদাশিব শায়িত। সদাশিব কুটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতীক। মহাকাল সৃষ্টি উন্মুখী সগুণ ব্রহ্ম। মহাকালের রূপান্তরই মহাকালী।

দেবী কালিকা পীনোন্নত পয়োধরা—দেবী স্তন্যদায়িনী মাতৃরূপা। তাঁর অন্নেই প্রতিপালিত এই জগৎ। মহাকালী বিপরীতরতাতুরা—শিব ও শক্তি—ব্রহ্ম ও মায়া, অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি, যেমন উভয়েই এক ও অভিন্ন, নির্গুণা কালী যখন সগুণা হন তখনই তিনি হন বিপরীতরতা। বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত যে বিপরীত সাধন, সেই সাধনের মূল প্রকৃতিই দেবী তাই তিনি বিপরীতরতা।

দেবী কালিকা শ্মশানবাসিনী—সুষুম্না নাড়ীকে বলা হয় শ্মশান। মহামায়া যিনি যোনিরূপা, এই যোনি ও চিতা উভয়ই শ্মশান। দেবী কালিকাকে যোনিরূপ শবশয্যা বলা হয়েছে। ভয়ংকরী শিবাপরিবৃতা মদ্যপান প্রমত্তা—দেবী শিবাপরিবৃতা। শিব প্রকৃতি মঙ্গলস্বভাব অপঞ্চীকৃত মহাভূত আর সত্ত্বগুণের প্রতীক শ্বেতবর্ণ অস্থিকঙ্কাল। সকল জীবের সত্ত্বাদিগুণগুলি শ্মশানে বিরাজ করছে।

দেবী মদ্যপান প্রমত্তা। দুই অর্থে এইভাব। প্রথমত, দেবী ব্রহ্মানন্দে বিভোর। এই আনন্দ মদ্য বই কী; কারণ যা আনন্দিত করে তাই মদ্য।

আবার অন্যদিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায়, দেবী মহিষাসুরকে বধ করার আগে পর পর দিব্য সুরাপান করতে লাগলেন এবং তাতে আরক্তনয়না হয়ে অট্টহাসি করলেন।

দেবী দক্ষিণকালিকা ছাড়াও আছেন—দেবী গুহ্যকালী, দেবী শ্মশানকালী, দেবী সিদ্ধকালী, দেবী ভদ্রাকালী, দেবী মহাকালী, দেবী রক্ষাকালী, দেবী চামুণ্ডাকালী প্রভৃতি। তাঁদের প্রত্যেকের ভেতর কিছু কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূল জায়গাটি এক।

দেবী মহামায়াই এই জগতের চালিকাশক্তি। তিনিই জীবের পরমগতি। তাঁর কথা বলে শেষ করা যায় না। তিনিই পরা প্রকৃতি, তিনিই দেশমাতৃকা, ভারতমাতা তিনিই, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁকে জানলেই সমগ্র জগৎকে জানা হয়।

দেবী তারা—দেবী তারার প্রধান তিনটি রূপ। একজটা, নীলসরস্বতী ও উগ্রতারা। তিনটি নামভেদ হলেও স্বরূপত তিনি এক ও অদ্বিতীয়া। মহাযান বৌদ্ধমতে দেবী তারা অবলোকিতেশ্বরের শক্তি। তিনি বৌদ্ধ দেবীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা। মনে করা হয় খ্রিস্ট্রীয় ষষ্ঠ শতকে দেবী তারা মহাযানী দেবমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে দেবী তারা জনপ্রিয় দেবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীকালে দেবী তারার একুশ রকমের রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। মহাযানী বৌদ্ধরা তারা দেবীকে ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের জননী ও সৃষ্টিকারণ বলে গ্রহণ করেছেন। ধ্যানীবুদ্ধ পাঁচজন, যথা—সিত, শ্যাম, লোহিত, নীল ও পীত। এই পাঁচ বর্ণের তারা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

দেবী তারা সাধককে ভোগ, মোক্ষ, যশ ও শ্রী দান করেন। সদা সর্বদা তিনি সাধককে ত্রাণ করেন। দেবী তারার সর্বসিদ্ধিপ্রদ বিভিন্ন রকমের মন্ত্র আছে। এই সকল মন্ত্র বিজ্ঞানমাত্র সাধক জীবন্মুক্ত হয় ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে। ধনে জনে পরিপূর্ণ হয়। রাজা তাঁর পক্ষে থাকেন। দেবী তারা বাক্‌শক্তি প্রদান করেন বলে তাঁকে নীলসরস্বতী বলা হয়। তিনি সাধককে পরিত্রাণ করেন ও মোক্ষ প্রদান করেন বলে তারা এবং উগ্র আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করেন বলে উগ্রতারা নামে কথিত হন।

নীলতন্ত্র ও মহাফেৎকারিণী তন্ত্র অনুসারে, একলিঙ্গ শিবালয়ে, শ্মশানে, শূন্যগৃহে, চতুষ্পথ স্থানে, যুদ্ধস্থানে, মুণ্ডাসনে, শবাসনে, আকণ্ঠ জলে, যোনিতে ও বিজনবনস্থলে বসে সাধক ত্রিভুবনেশ্বরী তারা দেবীর মন্ত্র সাধন করবে। সাধক শুদ্ধবুদ্ধি হয়ে এসকল স্থানে নীলসরস্বতীর মহামন্ত্র জপ করলে সর্বশাস্ত্রবেত্তা ও পরকালে নির্বাণ পদ লাভ করে।

সিততারা—সিততারা সাধারণত ত্রিনয়নী। দেবী পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। সিততারার সপ্তনয়না মূর্তিও দেখা যায়। সিততারারই এক তান্ত্রিকরূপ জাঙ্গুলী তারা। জাঙ্গুলী তারা চতুর্ভুজা। দেবী দুহাতে বীণা বাদনরতা। দেবীর এক হাতে অভয়মুদ্রা এবং অপর হাতে একটি সাদা সাপ। জাপানে সাদা সাপের মূর্তিতে দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। তাঁর হাতে বীণা। জাঙ্গুলীতারা আর সরস্বতী একই দেবী। জাঙ্গুলীতারা শ্যামবর্ণা ও পীতবর্ণা দুই রকমের হয়। শ্যামবর্ণা দেবী চতুর্ভুজা, পীতবর্ণা দেবী ষড়ভুজা।

পীততারা—দেবী পীততারা চতুর্ভুজা। দেবী তারার উগ্ররূপ।

শ্যামাতারা—দেবী শ্যামাতারা আদ্যাশক্তি। পদ্মের উপর বসে আছেন। তিনিই অবলোকিতেশ্বরের শক্তি।

নীলতারা—পীততারা যখন ষড়ভুজা হন তখনই তিনি নীলতারা।

খদিরবনিতারা—তারা মূর্তিগুলির মধ্যে খদিরবনিতারা, বজ্রতারা, ভৃকুটিতারা প্রভৃতি বঙ্গদেশে পাওয়া গেছে। খদিরবনিতারা পীততারার একটি বিশেষ রূপ।

বজ্রতারা—দেবী বজ্রতারার আট হাত, চার মাথা। প্রতিটি মাথায় তৃতীয় নেত্র আছে।

একজটা বা উগ্রতারা—দেবীর দুই রূপ। একরূপে দেবী দ্বিভুজা, এক হাতে খড়্গ, আরেক হাতে নরকপাল। দেবী শ্যামাতারার সহকারিণী। অন্য আর এক রূপে দেবী চতুর্ভুজা থেকে অষ্টাদশভুজা, বিংশতিভুজা পর্যন্ত। দেবী প্রত্যালীঢ়পাদা। লোলজিহ্বা, ভীষণ দ্রংষ্টা, অট্টহাসিনী, রক্তচক্ষু, ত্রিয়না নৃমুণ্ডমালিনী।

পর্ণশবরী—দেবীর পরনে পর্ণ। দেবী শবরদের ভগবতী। দেবীর তিনটি মাথা, সিত, পীত, লোহিত। দেবী তারারই তিনি অনুচরী।

ফেৎকারিণীতন্ত্রে বলা হয়েছে তারাদেবী প্রত্যালীঢ় অবস্থানে শবরূপী শিবের হৃদয়োপরি পদদ্বয় সমর্পণ করে দণ্ডায়মানা এবং অতিভয়ঙ্কর ও উচ্চৈঃস্বরে হাসওমানা। চারহাতে খড়্গ, নীলোৎপল, কতৃকা ও খর্পর ধারণ করে আছেন। দেবী হুঙ্কারবীজ থেকে উদ্ভূতা, খর্বাকৃতি ও নীলবর্ণা। দেবীর মাথায় অনেক বড়ো পিঙ্গলবর্ণ একটি জটা ও একটি সাপ আছে। দেবী ত্রিজগতের সকল রকম জড়তা বিনাশ করেন।

মা তারা মা নীল সরস্বতী যিনি প্রণতজনদের সৌভাগ্য সম্পদ প্রদান করেন। সকল অবস্থায় তিনি সকলের আশ্রয়। সকল অবস্থায় কারণে অকারণে ভক্তগণ তাঁকেই আশ্রয় করেন। □

ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ

ডাঃ মধুসূদন পাল

ইদানীং কমিউনিস্টরা তাদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে সামাজিক মাধ্যমে যখন তখন নানারকম মিথ্যা গল্প প্রচার করে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা তাদের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। যেমন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মিটিং ভাঙার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু নাকি গুন্ডা পাঠিয়েছিলেন। গুন্ডারা মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের। অথচ শ্যামাপ্রসাদ নিজে কোথাও এই কাহিনির উল্লেখ করেননি। কমিউনিস্টরা চিরকাল শ্যামাপ্রসাদ বিরোধী। যদিও শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে তারা ভোট দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গে থাকতে না পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে। পরে ক্ষমতার লোভে মুসলমান ভোটব্যাংকের স্বার্থে কমিউনিস্টরা ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে 'সাম্প্রদায়িক' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে কলঙ্কিত করার সবরকম চেষ্টা করেছে। এখনও তা অব্যাহত। এপার-ওপার দু'পারের মুসলমানদের দুঃখ হলো— পুরো বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। তাদের অতৃপ্ত ইচ্ছায় ইন্ধন জোগাতে কমিউনিস্টরা শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা প্রচার করেছে, এখনও করছে। মুসলিম লিগের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরি করেছ, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছি।'

সবকিছু বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শ্যামাপ্রসাদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কাহিনি নিছক গল্পই। এই গল্পটির উল্লেখ রয়েছে, সম্ভবত কোনো কমিউনিস্ট নেতার লেখায়। সেটাই ওরা বারবার উল্লেখ করে। এটা এক ধরনের চালাকি। কারণ কোনো বিশেষ একজনের বলা কাহিনি যতক্ষণ না বিভিন্ন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ইতিহাসের অংশ হতে পারে না। 'সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদ সংঘাত'-এর আখ্যান বামপন্থীদের অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

সুভাষচন্দ্র প্রথমে কংগ্রেস, পরে নিজের তৈরি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে। স্বভাবতই দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মধ্যে কিছু বিরোধী মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদের সংঘাতের গল্প একদমই বামপন্থীদের মস্তিষ্কপ্রসূত। সুভাষচন্দ্র গুন্ডা পাঠিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে মারতে চেয়েছেন এটা নির্জলা মিথ্যা। শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে কমিউনিস্টদের মিথ্যা কাহিনি তৈরির এটা অন্যতম উদাহরণ মাত্র।

সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদ সখ্য অনেক গভীরে। বাইরে থেকে তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বারের উপাচার্য (১৯৩৪-৩৮)। কুযুক্তির ধারক-বাহকরা বলতেই পারে, তিনি ব্রিটিশের চাকরি করেছেন, সুতরাং তিনি ব্রিটিশের

কংগ্রেসের সদস্য না হয়েও গান্ধীর অনুরোধে দু'জন ব্যক্তি নেহরু মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। একজন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন ড. বি.আর. আম্বেদকর। দু'জনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মহীয়ান। কংগ্রেসের মধ্যে এঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

ফঃ ৫

দালাল। তাহলে বলতে হয়, শ্যামাপ্রসাদের পিতা তথা বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষও ব্রিটিশের দালাল। কারণ, তিনিও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। একই যুক্তিতে সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য মেঘনাদ সাহা প্রমুখ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও বিশিষ্টজন হলেন ব্রিটিশের দালাল। অথচ, এদের দেশপ্রেমের তুলনা হয় না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে এবং বর্তমানেও দেশভক্তদের অনুপ্রাণিত করছে, তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। স্যার আশুতোষ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ— পিতা-পুত্র ব্রিটিশের অধীনস্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে যে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাক্রম এবং পরাধীন দেশে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারের জন্য সায়েন্স কলেজ চালু করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে, তাও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা স্তর। শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামই স্বাধীনতা যুদ্ধের একমাত্র স্তর হতে পারে না।

দেশের বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার যে পথ দেখিয়েছেন, সেটাও জাতির মুক্তি সংগ্রামের একটা বড়ো অধ্যায়। শুধু তাই নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য মেঘনাদ সাহা, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু— এঁরা গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন দিনের পর দিন।

ড. শ্যামাপ্রসাদের বিচরণ উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর যোগদান পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে। ১৯৩৫-এর পর থেকেই বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লিগের বাড়বাড়ন্ত। ১৯৩৭ থেকে লিগের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ। বঙ্গপ্রদেশের হিন্দুদের জীবন, মানসম্মান দুর্বিষহ করে তোলে তারা। হিন্দুদের হয়ে কথা বলার কোনো রাজনৈতিক দল তখন ছিল না। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশেই তখন মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৪ শতাংশ)। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তখন সুভাষচন্দ্র বিরাজমান। কিন্তু তার পক্ষেও প্রকাশ্যে হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার হয়তো কিছু সমস্যা ছিল সর্বভারতীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতায়। কারণ, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান শত্রু ইংরেজ। সেখানে হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে বা হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ যুদ্ধের (যুদ্ধ অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম) মধ্যে আর একটা যুদ্ধের ফ্রন্ট তৈরি করে দেওয়া। তিনি একইসঙ্গে দুটো ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে চাননি।

সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন, যাতে মুসলিম লিগ বঙ্গপ্রদেশে ক্ষমতায় না আসতে পারে। কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক এবং কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু যৌথভাবে চেয়েছিলেন বঙ্গপ্রদেশে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হোক। এতে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যেত। কিন্তু গান্ধী ও তার গোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়। ফজলুল হক বাধ্য হন মুসলিম লিগকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গের মসনদে বসতে। ভারতবর্ষে এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পায় মুসলিম লিগ। গান্ধী সুকৌশলে বঙ্গপ্রদেশের কংগ্রেসকে তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছিলেন যারা সবসময় দলাদলি করত নিজেদের মধ্যে। গান্ধীর উদ্দেশ্যই ছিল, এই দলাদলি থাকলে ভারতবর্ষের বৃহত্তম প্রাদেশিক কংগ্রেস কখনও গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। এতে তার সিংহাসন থাকবে অটুট। বঙ্গের ক্ষমতা থেকে মুসলিম লিগকে দূরে রাখতে একদিকে সুভাষচন্দ্র, অন্যদিকে ফজলুল হকের চেষ্টা ব্যর্থ হয় কিছু সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায়। এই প্রেক্ষিতেই শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিতে প্রবেশ। গান্ধীর পরোক্ষ মদতে বঙ্গপ্রদেশের মাটিতে মুসলিম লিগের উত্থান না হলে রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের প্রবেশ হয়তো ঘটতই না। এই বক্তব্যের সমর্থনে দু'টি ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(১) জিন্না ছিলেন মুসলিম লিগ বিরোধী। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। গান্ধী-নেহরুদের বার বার অপমানে তিনি বাধ্য হন কংগ্রেস ত্যাগ করতে, আর সেই অপমানের বদলা নিতেই তার মুসলিম লিগে যোগদান। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে তৈরি হলেও, সমগ্র দেশে মুসলিম লিগের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয় এই দলে জিন্নার যোগদানের পর। অর্থাৎ পরোক্ষে গান্ধীর জন্যই মুসলিম লিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে।

(২) ১৯৩৭-এ অসমে (অসম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের সম্মিলিত রূপ) মুসলিম লিগ সরকার গঠিত হয়। নাম— সাদুল্লা সরকার। এখানেও মুসলিম লিগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তারা নির্দল এমএলএ-দের নিয়ে সরকার গঠন করে। কোনো কংগ্রেস নেতা সেখানে লিগ সরকার পতনের উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে সুভাষচন্দ্র তৎকালীন অসমের রাজধানী শিলঙে কয়েকদিন ছিলেন। সমস্ত নির্দল এমএলএ -দের ডেকে সাদুল্লা সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বড়দোলইকে প্রধানমন্ত্রী করে তিনি ফিরে আসেন। এরপর মুসলিম লিগ আর কখনও ক্ষমতায় আসেনি অসমে। বিভাজনের পরে উত্তর-পূর্ব ভারত যে এখনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত তার একমাত্র কারিগর সুভাষচন্দ্র। তাঁর দুঃখ ছিল, তিনি বঙ্গপ্রদেশের ক্ষমতা থেকে মুসলিম লিগকে দূরে রাখতে পারেননি। পরবর্তীকালে তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করেছেন শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হকের একত্রীকরণ, অর্থাৎ শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা তৈরির মধ্য দিয়ে। এই সরকার তৈরি হয়, মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে। অবশ্য এই সরকারের আয়ু ছিল সামান্যই (১১.১২.১৯৪১-২০.১১.১৯৪২)। এই সরকারকে সমর্থন জানান সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা এবং তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু। ব্রিটিশ সরকার শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেয় দক্ষিণ ভারত। মুসলিম লিগকে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে বঙ্গপ্রদেশে সরকার গঠন ছিল সুভাষচন্দ্রের মত ও পথ অনুযায়ী চলা একটি প্রক্রিয়া।

সুভাষচন্দ্র নির্দেশিত পথেই হেঁটেছেন শ্যামাপ্রসাদ। এই বক্তব্যের সমর্থনেও রয়েছে একাধিক উদাহরণ। নভেম্বর ১৯৪৫, দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার শুরু

করে ব্রিটিশ সরকার। এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের যুবক ও ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়ে প্রতিবাদ জানায়। এরপরেই শুরু হয়ে যায় ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ নৌবিদ্রোহ। 'The Sunday Amrita Bazar Patrika'-র ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এর হেডলাইন ছিল এইরকম— 'MILITARY POLICE RULE IN BOMBAY, RECURRENCE OF TROUBLES, Firing & More Firings : 250 killed and 1300 injured'। অর্থাৎ ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশের গুলিতে বোম্বেতে ২৫০ জন নিহত এবং ১৩০০ জন আহত।

'Hindusthan Standard'-এর Calcutta edition-এ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এর সংবাদ— '45 killed in police firing in Calcutta.'

এর ঠিক দু'সপ্তাহ আগে কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে পালন করেছে ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিন। কলকাতার চৌরঙ্গীতে দু'মাইল লম্বা শোভাযাত্রা হয়েছে, 'I.N.A. Volunteers formed an impressive part of the two-mile long procession taken out on Wednesday in celebrations of Netaji Subhas Bose's birthday in Calcutta.'

যখন ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপট, তখন নৌবিদ্রোহ ও ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিক্ষোভে কলকাতা উত্তাল। এজাতীয় ঘটনা ইংরেজদের পৌনে দু'শো বছরের শাসনকালে কখনও দেখা যায়নি। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলেন না। ছাত্র-যুব ও জনগণের এই সম্মিলিত প্রতিবাদ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারা এই জন-আন্দোলনে যোগ দিতে ভয় পাচ্ছিলেন। একটাই কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশরাজের ভয়ংকর রোষানল।

নভেম্বর ১৯৪৫-এ কলকাতায় পালিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস। এটা ছিল আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। তখন শরৎচন্দ্র বসু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কিছু ছাত্র নিহত হয় ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনার গুলিতে। বিভিন্ন কারণে শরৎচন্দ্র বসুও যোগ দিতে পারেননি ওই আন্দোলনে। সেই সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন গুরুতরভাবে।

পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ তৈরির প্রেক্ষাপটে একমাত্র শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া সমস্ত গণ্যমান্য সুভাষ অনুরাগীরা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদের সমর্থক। যেমন, মেজর জেনারেল ডাঃ এসি চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন আইএনএ সেনানী), সুভাষচন্দ্রের 'bosom friend' (অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু) অধ্যাপক হেমন্ত সরকার, নেতাজীর বড়দা সতীশচন্দ্র বসু। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও বিজ্ঞানী শিশির মিত্র। সুভাষচন্দ্র অনুগামী সমস্ত কংগ্রেসি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মানুষজন সমর্থন করেন শ্যামাপ্রসাদকে।

কংগ্রেসের সদস্য না হয়েও গান্ধীর অনুরোধে দু'জন ব্যক্তি নেহরু মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। একজন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন ড. বি.আর. আম্বেদকর। দু'জনেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মহীয়ান। কংগ্রেসের মধ্যে এঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। দু'জনেই পরবর্তীকালে নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন, তার ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে।

নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ তৈরি করেন নতুন দল 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ'। দিনটি ছিল ২১ অক্টোবর, ১৯৫১। এই দিনটি কিন্তু কোনোভাবেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফল নয়। ৮ বছর আগে, ১৯৪৩-এ সুদূর সিঙ্গাপুরের মাটিতেই ২১ অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন আজাদ হিন্দ সরকার। নেতাজীরও এই দিনটি হঠাৎ নির্ধারিত ছিল না। তা ছিল অনেক চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর দিনটি ছিল শনিবার। শুক্রবার সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে মধ্যরাত্রিতে প্রবেশ করে সারারাত্রি আরাধ্যাদেবী মা কালীর পায়ের কাছে বসে একান্তে সাধনা করে ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই দিনটি প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল। ইতিহাসের এই পথ ধরেই শ্যামাপ্রসাদ অগ্রসর হন জনসঙ্ঘ তৈরির কাজে। সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে গোপনে বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য প্রথম পছন্দের জায়গা ছিল জাপান; ইউরোপ নয়। তাঁর জাপানে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে ভারতবর্ষের ভিতর থেকে গোপনে সাহায্য করেছিলেন বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং জাপান থেকে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে।

ইতিহাস ভুলে গেলে বিশ্লেষণও ভুল হবে। বিপ্লবী সাভারকর ছিলেন হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। অন্যদিকে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী ছিলেন জাপান হিন্দু মহাসভার সভাপতি। আর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু মহাসভার সভাপতি। আশা করা যায়, ইতিহাসের অদৃশ্য পৃষ্ঠাগুলো একদিন যুক্তিসঙ্গত চিন্তায় ধরা পড়বেই। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি হয়তো অনেকে জানেন না, কিংবা জেনেও না জানার অভিনয় করেন। কারণ, এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত নিয়ে গল্প তৈরি এবং তার প্রচার মার খাবে। □

With best compliments from -

A Well Wisher

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস

বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, কয়েকটি প্রসঙ্গ

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

একদিন যারা স্লোগান তুলেছিল, 'হাত মেঁ বিড়ি, মু মেঁ পান। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' অখণ্ড ভারত ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান চাই। আমদানি করেছিল 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। চিৎকার করে বলেছিল— 'মুসলমানরা শুধু ধর্মে আলাদা নয়, জাতিতেও আলাদা।' কী আশ্চর্য, ভারত ভাগ হওয়ার পরে সেই জেহাদিদের সমর্থক একদল লোক প্রচার করতে শুরু করলো— 'এক জাতি এক প্রাণ, হিন্দু মুসলমান।' এরা ভারতের বামপন্থী। দ্বিচারিতা ও মিথ্যাচার যাদের 'রাজনৈতিক আদর্শ'।

কমিউনিস্টরা বরাবর আলাদা দেশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারা থেকে গেল ভারতে। বাকিরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে ঢুকে পড়ল এদেশে। মুসলিম লিগের এইসব সহযোগীদের অন্তত একটি 'কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান' তৈরি হলো না। 'কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া' নাম নিয়ে এদেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালালো। আদর্শগত দিক থেকে যা 'মুসলিম লিগের বি টিম'। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে কি? 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র মুখোশে আর সবকিছু তারা প্রচার করলো। শুধু কৌশলে গোপন করে গেল আসল কথাটি। ততদিনই মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, সমাজবাদ চলে, যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানরা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হলে কী পরিস্থিতি হতে পারে আজকের বাংলাদেশ ও পাকিস্তান প্রমাণ করে ফেলেছে।

কমিউনিস্টরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুধু বিকৃত করেনি, উলটে দিয়েছে বহু ক্ষেত্রে। নেতাজীর জীবন নিয়ে সবচেয়ে বেশি মিথ্যাচার করেছে তারাই। তাঁর তৈরি 'ফরওয়ার্ড'কে অর্থের জোরে হাইজ্যাক করেছে। সে অর্থের জোগানদার ছিল ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি। নেতা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি। নেতাজীর ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ ছিল জাতীয়তাবোধ। হ্যাঁ জাতীয়তাবোধ, ভারতীয়ত্ব। আজকের কমিউনিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যার আদর্শগত কোনো সম্পর্ক নেই। পতাকা ছিল নেতাজীর তৈরি। তিরঙ্গার উপরে লম্ফোদ্যত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভাবনা ছিল 'সুভাষবাদ'। সেটাই সম্পূর্ণ পালটে হয়ে গেল 'মার্কসবাদ'। পতাকা হয়ে গেল লালের গায়ে বাঘের ছবি। সঙ্গে কাস্তে হাতুড়ি। তেরঙ্গা থেকে সরাসরি লাল! ভাবা যায়? নিজেদের লুকাতে এই কিছুদিন আগে বাঘ ছাপের লাল ঝান্ডা থেকে সরিয়ে নিয়েছে কাস্তে হাতুড়ি। সেই বামপন্থীরা তাদের মুখপত্রে ছবি ছাপিয়ে নেতাজীকে 'তোজোর কুকুর' বলবে তাতে আশ্চর্য কী!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। আন্তর্জাতিকভাবে প্রচণ্ড চাপে ইংরেজ। বেশিরভাগ সেনা যুদ্ধে ব্যস্ত। প্রশাসনিকভাবে বেসামাল ব্রিটিশ সরকার। এটাই তো আদর্শ সময়। আন্দোলনে প্রতিবাদে প্রতিরোধে শাসককে নাজেহাল করে তোলার। ছিনিয়ে নেওয়া কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। গান্ধীজী ডাক দিলেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'। ১৯৪২ সালের ৬ আগস্ট শুরু হলো ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই সময়ে ভারতের বামপন্থীদের ভূমিকা কী ছিল? নির্লজ্জরাও লজ্জা পাবে তাদের সেদিনের আচরণে। তারা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। একেবারে সরাসরি বিরোধিতা। কারণটা ছিল বড়ো অদ্ভুত। তারা ঘোষণা করেছিল অত্যাচারী ইংরেজ তাদের বন্ধু দেশ। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমিউনিস্ট রাশিয়ার মিত্র দেশ ইংল্যান্ড। তখন তাদের (কু)যুক্তিতে ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে কমিউনিস্ট দেশ রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা বেশি জরুরি। অথচ এরাই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে বড়ো বড়ো যুক্তি নামায়। বাতেলা দেয়। অন্যদের দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট দেয়!

আলি জিন্না'রা আগেই বুঝেছিলেন কলকাতা বাদে পূর্ববঙ্গ 'পোকায় কাটা'। তাই কলকাতা-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানে সংযুক্তির অভিসন্ধি চলে জোরকদমে। ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬। হিন্দু বাঙ্গালির জীবনে অন্ধকারতম দিন। সুরাবর্দি তখন বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছে মোল্লাবাদী সৈয়দ মহম্মদ ওসমানকে। লক্ষ্য 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। লক্ষ্য হিন্দুশূন্য কলকাতা। লক্ষ্য কলকাতা-সহ গোটা বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি। ময়দানের সমাবেশ ডাকলো মুসলিম লিগ। অংশগ্রহণকারীদের হাতে লাঠি, বর্শা, চপার, হাতুড়ি। উদ্দেশ্য লুঠ, হিন্দু হত্যা। সেদিন জড়াজড়ি করে অর্ধচাঁদ সবুজ পতাকার সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল লাল ঝান্ডা। মুসলিম লিগের সুরাবর্দি, নাজিমুদ্দিন, জিন্নার সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে হিন্দু হত্যার উসকানি দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট নেতারা। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ঠিক আগের দিন বঙ্গের লিগ সরকার কমিউনিস্ট নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নলিনী দাস প্রমুখদের মুক্তি দিয়েছিল। কোনো কারণ ছাড়া এটা সম্ভব? এ ঘটনা নেহাত কাকতালীয় হতে পারে? একতরফা হিন্দু হত্যা লাগাতার চললো। ১৬ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট। সতেরো হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হলো। রাস্তা, নর্দমা, গঙ্গার পাড়, অলিগলি-সহ কলকাতার সর্বত্র স্তূপ হয়ে থাকলো হত্যা হওয়া হিন্দুদের মৃতদেহ। সৎকারহীনদের খুবলে খেতে লাগল শেয়াল-শকুন।

এসব নৃশংসতার দায় সযত্নে ঝেড়ে ফেলেছে এদেশের বামপন্থীরা। চীন-রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা ইতিহাস আজকের পাঠ্য। সে ইতিহাসে আড়াল করা হয়েছে প্রকৃত বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা। নিজেদের স্বার্থ পূরণের ছাঁচে ফেলে বিকৃত করেছে ভারতবর্ষের পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে। তাই নতুন করে ভারতের ইতিহাস রচনা সময়ের দাবি। অল্প পরিসরে হলেও শুরু হয়েছে সে উদ্যোগ। এতদিন ধরে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে কিছু স্বাধীন স্বর শোনা যাচ্ছে। কিছু মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে উত্থিত। 'দ্য কেরালা স্টোরি', 'ছাওয়া' 'কাশ্মীর ফাইলস্', 'বেঙ্গল ফাইলস্' প্রভৃতির মতো কিছু সিনেমা তৈরি হচ্ছে। যা অন্য চোখে ইতিহাস দেখার মুক্ত জানালা নিশ্চিত। বিচারের ভার বরং মানুষের উপর থাক। বন্ধ হোক অশালীন আক্রমণ। প্রতিবাদে আর একটা সিনেমা তৈরি হতে বাধা কোথায়? এতদিন ধরে ঘোর হয়ে থাকা ভুলের কুয়াশা কেটে প্রকাশিত সত্যের আলোকে পথ হাঁটবে গোটা দেশ। সেই প্রতিজ্ঞা সূর্য আজ উঁকি দিচ্ছে পুব আকাশে। □

সবুজ সাধক ‘বিনয় দাস’ : এক মানুষ, এক বনসেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমান পৃথিবী এক গভীর সংকটের মুখে। মানুষ তার আধুনিকতার অহংকারে প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। গাছপালা, জঙ্গল, বনভূমি— সব যেন মানুষের প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে ধ্বংসের পথে। ফলস্বরূপ বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির ফলের গাছ, ভেষজ উদ্ভিদ, পাখি ও প্রাণীজগৎ। এই বিপন্ন পরিস্থিতিতে এক সাধারণ মানুষ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন এক অসাধারণ সবুজ বিপ্লব— তাঁর নাম বিনয় দাস, কোচবিহারের হাজরাপাড়া নিবাসী।

‘সবুজ বিনয়’ নামে পরিচিত এই মানুষটি প্রকৃত অর্থেই জীবন্ত উদাহরণ— কেমন করে একার উদ্যোগে সবুজ বিপ্লব করা যায়। প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার আগে তিনি হাতে নেন একটি বালতি, বাঁশের দণ্ড, এক খন্তা ও কয়েকটি চারাগাছ। ভোর ৫টাতেই শুরু হয় তাঁর নিত্য সাধনা— বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপরিচর্যা। নিজের অর্থে, নিজের শ্রমে, কোনো সরকারি অনুদান ছাড়াই তিনি এখন পর্যন্ত ১২,০০০-এরও বেশি গাছ লাগিয়েছেন, যার অধিকাংশই আজ সবল ও জীবন্ত।

সবুজ মিশনে একাকী যোদ্ধা : বিনয় দাসের জীবনচক্র যেন গাছের ছায়াতেই আবর্তিত। ভোর ৪-৩০-এ প্রণায়াম শেষে তিনি বেরিয়ে পড়েন গাছের খোঁজে— কোথায় শুকিয়ে যাচ্ছে, কোথায় নতুন চারা লাগাতে হবে। সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে এই সেবাযজ্ঞ। এরপর তিনি নিজের চাকরিস্থল যান— রাজবাড়ি অফিস কর্মরত। কাজের ফাঁকেও নজর রাখেন তাঁর লাগানো গাছগুলির উপর সন্তানদের মতো। প্রতিটি চারাগাছ তিনি বাড়িতে এক বছর লালন-পালন করে তবে মাটিতে রোপণ করেন।

বৃক্ষরোপণ নয়, বৃক্ষলালনের সাধনা : আজ অনেকেই বৃক্ষরোপণ করেন, কিন্তু পরিচর্যার অভাবে গাছ বেঁচে থাকে না। অথচ বিনয় দাসের লাগানো প্রায় ১০০ শতাংশ গাছই জীবন্ত— সেটাই তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। তিনি বলেন— ‘গাছ লাগানো নয়, গাছকে বড়ো করা— সেটাই প্রকৃত সাধনা।’ তাঁর লাগানো গাছের তালিকায় আছে— আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কদবেল, জামরুল, কামরাঙা ইত্যাদি স্থানীয় ও ফলদ বৃক্ষ। তাঁর বিশ্বাস, ‘যে গাছে মানুষ ও পাখি দুজনেই উপকার পায়, সেই গাছই সত্যিকার অর্থে জীবনদায়ী।’

তাঁর বক্তব্য— ‘শাল, সেগুন নয়; লাগাতে চাই ফলের গাছ— যাতে মানুষ ছায়া পায়, পাখি বাসা বাঁধে।’

বিনয়ের সবুজ বিপ্লবের প্রধান প্রকল্পসমূহ :

ঝাউবন— হাজরাপাড়া, তোর্সা নদীর তীরে

খাঁদাবন— বিসর্জনঘাষ সংলগ্ন এলাকায়

পঞ্চবটি— হারিণচৌরা অঞ্চলে

খণ্ড বন— শহরের প্রান্তবর্তী তোর্সা নদীপারে

রাজবাড়ি লঘু বন— কোচবিহার রাজবাড়ির পেছনে

এই পাঁচটি ছোটো বন এখন শুধু বৃক্ষরাজি নয়— স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল, স্কুল শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষের ধ্যান ও বিনোদনের স্থান।

‘ট্রি অ্যাম্বুলেন্স’— সবুজ বিনয়ের অভিনব উদ্যোগ

সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে চালু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ‘ট্রি অ্যাম্বুলেন্স’— একটি চলমান সবুজ সেবা যান। এটি ব্যবহার হয় আহত, উপড়ে যাওয়া বা ঝড়বিধ্বস্ত গাছ বাঁচাতে, চারাগাছ পরিবহণে এবং পরিবেশ সচেতনতা প্রচারে। একটি এখন কোচবিহারের সবুজ আন্দোলনের প্রতীক।

সম্মান ও স্বীকৃতি : বিনয় দাসের নিরলস প্রয়াসের জন্য তিনি পেয়েছেন বহু সম্মান— বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বনমহোৎসব ২০২৪’-এর প্রশংসাপত্র। কোচবিহার বিভাগীয় বন আধিকারিক, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ, এসডিও সদর, এসপি কোচবিহার ও চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের সংবর্ধনা। জাতীয় পরিবেশ যুব সংসদ ২০২২ থেকে গ্রাসরুট ইকোলজিক্যাল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

২০২৫ রাম কোঠারি শরত কোঠারি প্রতিভা সম্মান লাভ করেছেন।

স্থানীয় সাংসদ শ্রী নিশীথ প্রামাণিক ও ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়ের বিশেষ প্রশংসা।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫, ০০০ বৃক্ষরোপণ,

প্রতিটি বিদ্যালয় ও মন্দির প্রাঙ্গণে একটি করে লঘু বন তৈরি

গ্রামীণ যুবকদের নিয়ে ‘Green Benoy Foundation’ গঠন,

শহরের চারপাশে সবুজ করিডোর তৈরি,

বিদ্যালয় পর্যায়ে ইকো-লিটারেসি কর্মশালা আয়োজন,

আগামী দিনের বিনয় দাসের লক্ষ্য, কোচবিহার জেলায় ৩০টি নদীর পাড়ে লঘুবন তৈরি করা,

শেষকথা : মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতিকে ভুলে গেছে, তখন বিনয় দাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন— ‘গাছ শুধু ছায়া দেয় না, সে জীবন দেয়।’ তাঁর মতো মানুষই প্রমাণ করেন, সরকারের বড়ো প্রকল্পের থেকেও এক ব্যক্তির আন্তরিকতা কত গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের সমাজ, সরকার ও তরুণ প্রজন্মের উচিত তাঁর মতো সবুজ সৈনিকদের পাশে দাঁড়ানো। বিনয় দাস শুধুই এক ব্যক্তি নন— তিনি এক যুগের সবুজ বিবেক, এক বৃক্ষসাধক, এক জীবনদায়ী প্রেরণা। □

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

দুই বন্ধুতে খুব ভাব। তারা সবসময় একসঙ্গে থাকে। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে। লোকে তাদের মানিকজোড় বলে। একদিন সেই দুই বন্ধু জঙ্গলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। গল্পে, কথায় তারা একেবারে মশগুল।

হঠাৎ একটি ভালুক তাদের সামনে এসে গেল। দুই বন্ধুর মধ্যে একজন আগে ভালুকটাকে দেখতে পেল। সে 'ভালুক' বলে একবার চিৎকার করেই রাস্তার ধারে একটা বড়ো গাছে উঠে পড়ল। একবার ফিরেও দেখল না তার বন্ধু কোথায় গেল, তার কী হবে। এসব কথা তার মাথায়ও এল না।

দ্বিতীয় বন্ধু কী আর করে! সে তো ভালুকটাকে আগে দেখতেই পায়নি। যখন দেখল তখন ভালুক একেবারে কাছিকাছি এসে পড়েছে। এই সময়ের মধ্যে সে না পারবে পালাতে, না পারবে গাছে উঠতে। খালি হাতে তো ভালুকের সঙ্গে লড়াই করা যায় না!

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে, মরা মানুষের মাংস ভালুক খায় না। ছুঁয়েও দেখে না। সে তখন ভাবল, তাহলে আমি মরার মতো নিঃশ্বাস বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে থাকি। তাহলে ভালুকটা আমাকে মরা মানুষ ভেবে আর আক্রমণ করবে না। তারপর যা থাকে কপালে! এই ভেবে সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ভালুক এসে দেখল একটা মানুষ শুয়ে আছে। ভালো করে তার নাক-কান-চোখ-মুখ শুঁকে শুঁকে দেখল। ভালুকটি দেখল মনে হলো এ তো মরা মানুষ। নিঃশ্বাস পড়ছে না। বুক ওঠা-নামা করছে না। নাঃ, একে দিয়ে তার কিছু লাভ হবে না। ভালুকটা ফিরে চলে গেল।

ভালুকটা চলে গেলে, চারদিক দেখে নিয়ে লোকটি উঠে বসল। সে এতক্ষণ দম বন্ধ করে শক্ত কাঠ হয়ে পড়েছিল। এবার সে একটা বড়ো করে নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল।

তার বন্ধুটি তো গাছ থেকে সবকিছুই দেখছিল। ভালুকটা চলে যেতেই সে গাছ থেকে নেমে তার বন্ধুর কাছে চলে এল। এসেই বন্ধুকে বলল, হ্যাঁ ভাই, ভালুকটা তোমার কানে কানে কী বলল? আমি ওপর থেকে দেখছিলাম ভালুকটা তোমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল, তোমার জন্য কী যে চিন্তা হচ্ছিল আমার!

তার বন্ধু তখন বলল, ভালুকটা বলে গেল— যে বন্ধু বিপদের মুখে বন্ধুকে ফেলে পালিয়ে যায় তাকে কোনাদিন বিশ্বাস করো না। যে বন্ধু বিপদে পাশে থাকে না, সে প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

গুইন্ডি

গুইন্ডি জাতীয় উদ্যান চেন্নাই মহানগর এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম উদ্যানগুলির মধ্যে একটি। এর আয়তন ২.৭০ বর্গকিলোমিটার। উদ্যানটি তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজ্যপালের বাসভবনের চারপাশ জুড়ে রয়েছে। উদ্যানে রয়েছে ৩৫০টিরও বেশি প্রজাতির গাছপালা, ১৪টিরও বেশি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৫০ টিরও বেশি প্রজাতির পাখি, ৩০ প্রজাতির মাকড়সা এবং ৬০ রকমের প্রজাপতি। পার্কের ভেতরেই রয়েছে স্নেকপার্ক ও শিশু পার্ক। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ। উদ্যানটির সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করতে হলে বনরক্ষীদের থেকে অনুমতি নিতে হয়। মঙ্গলবার বাদে সপ্তাহের বাকি দিনগুলি সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি খোলা থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৫

শিষ্টাচার

হরি ঔম্ – হ্যালো।
সুপ্রভাতম্ –সুপ্রভাত।
নমস্তে/নমস্কারঃ –নমস্কার।
শুভরাত্রিঃ –শুভরাত্রি।
ধন্যবাদঃ –ধন্যবাদ।
স্বাগতম্ –স্বাগত।
শুভদিনম্ –শুভদিন।
ক্ষম্যতাম্ –ক্ষমা করবেন বা মাফ করবেন।
চিন্তা মাস্তু – চিন্তা নেই বা কিছু ভাববেন না।
কৃপয়া – দয়া করে।
পুনঃ মিলামঃ –আবার দেখা হবে।
অস্তু –আচ্ছা বা ঠিক আছে।

ভালো কথা

পূজার আনন্দ

এবার দুর্গপূজার কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার ক্লাবের মিটিঙে ঠিক হয়েছিল গরিব মায়েদের শাড়ি দেওয়া হবে। মিটিঙেই ৫০জন একটি করে শাড়ি দেবেন ঠিক হয়। মিটিঙেই আমার দাদু প্রস্তাব রেখেছিলেন, কয়েকজন গরিব ছেলে-মেয়েকেও জামা-প্যান্ট দেওয়া হবে। আর তা দেওয়া হবে যাদের বাড়ির ছেলে-মেয়ে একের বেশি জামা-প্যান্ট পেয়েছে তাদের থেকে নিয়ে। সেইমতো ২০ জনের তালিকা হয়েছিল। আমার নাম আমার দাদু বলেছিলেন। সেইমতো ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় ৫০জন মা এবং ২০জন ছোটো ছেলে-মেয়ে পূজামণ্ডপে আসে। মায়েদের হাতে বড়োরা তুলে দিচ্ছিলেন। ছেটোদের জন্য আমার মতো যারা দেবে তারাই ছেটোদের হাতে এক-এক করে তুলে দিচ্ছিল। নামোপাড়ার পিঙ্কির হাতে দেবার সময় আনন্দে আমার চোখে জল এসেছিল। আমি রাজেনকাকুকে বলেছি প্রতি বছর আমি দেব।

পূজা মহান্তি, পঞ্চমশ্রেণী, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) পা ন উ দ	(১) র চ হ স বা আ ল্য
(২) ব ত্ত র ঙ্গ	(২) ন ন্ধা স নু ঈ রা শ্ব

১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হিমশীতল (২) সুরসাধনা

১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হাজারদুয়ারি (২) সিংহশাবক

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) কৃত্তিকা মণ্ডল,মকদুমপুর, ই বি, মালদা। (৩) প্রতিমা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) সুদেব সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

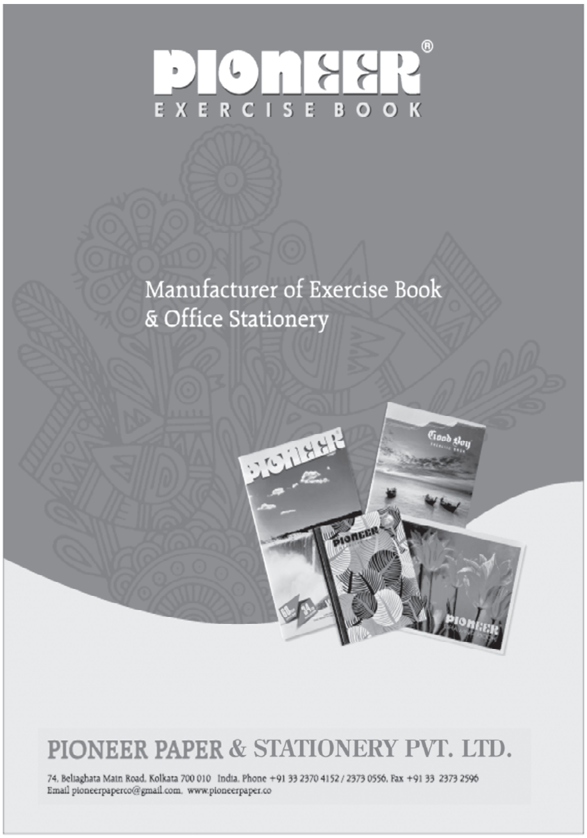

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

মহান বিপ্লবী রাসবিহারী

পিএন ঠাকুর থেকে বোস অফ নাকামুরায়া

প্রণব দত্ত মজুমদার

ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিএন ঠাকুরের ছদ্মবেশে জাপানে গিয়ে পৌঁছলেন রাসবিহারী বসু। মাথা গোঁজার একটি ঠাঁইও করে নিলেন। কিন্তু সমস্যায় পড়লেন ওখানকার ভাষা নিয়ে। ভারতীয়দের সন্ধানে তিনি টোকিয়ো শহরে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলেন। ঈশ্বরের কৃপায় ভগবান সিংহ গিয়ানি নামে একজন গদর বিপ্লবীর সন্ধান পেয়ে গেলেন। তিনিও ছদ্মবেশে জাপানে আছেন। ১৯১৩ সালে কানাডা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি জাপানে এসেছেন। দুজনের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিনি রাসবিহারীকে জাপানে নির্বাসিত বিখ্যাত চৈনিক বিপ্লবীনেকতা সান-ইয়াত-সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি তখন ঔপনিবেশিকতা থেকে চীন তথা এশিয়ায় মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী ছিলেন। সান-ইয়াত-সেনকে নতুন চীনের রূপকার বলা হয়। তাঁরই শিষ্য ছিলেন চিয়াং কাইশেক এবং মাও-সে-তুং। তাঁরা মাঝে মাঝেই হিবিয়া পার্কের মাতসুমতরো কাফেতে (Matsumotoro Cafe in Hibita Park) মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং প্যান-এশিয়ান মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনা করতেন।

সান-ইয়াত-সেন রাসবিহারীর চিন্তাভাবনার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি রাসবিহারীকে আর এক বিখ্যাত জাতিয়তাবাদী জাপানি চিন্তাবিদ অধ্যাপক মিতসুরু তোয়ামার (Mitsuru Toyama) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অধ্যাপক তোয়ামাও ছিলেন প্যান-এশিয়ান মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রধান প্রবক্তা। জাপান তখন ব্রিটিশের মিত্রদেশ ছিল এবং ইংরেজশক্তিকে সমীহ করে চলত। অধ্যাপক তোয়ামা জাপানের এই ইংরেজ ভজনার তীব্র নিন্দা করতেন। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাপানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তাদের অন্যতম, ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির সেক্রেটারি, জাপান সরকারের তৎকালীন ভূরাজনৈতিক অবস্থানের তীব্র সমালোচক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হন এবং অচিরেই প্যান-এশিয়ান মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে রাসবিহারীকে তাঁর অনুগামী শিষ্য করে নেন। ইতিমধ্যে রাসবিহারীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় জাপানে আত্মগোপনকারী আর এক বাঙ্গালি বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্তের সঙ্গে। তখন জাপানে অবস্থান করছিলেন পঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা লালা লাজপত রায়। রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ হয়ে গেল।

এইভাবে রাসবিহারী যখন জাপানে তাঁর পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে শক্ত করছিলেন, সেই সময় একটি ঘটনায় তিনি এক ভয়ানক বিপদে পড়ে গেলেন। ব্যাপার হলো, ভারত ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য, জাপানের জনগণের কাছে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির কথা তুলে ধরার জন্য এবং ইংরেজ সরকার ভারতের উপর কীরকম শোষণ চালাচ্ছে তা জাপানের জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য ১৯১৫ সালের ২৭ নভেম্বর টোকিয়োতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন লালা লাজপত রায়, রাসবিহারী বসু, হেরম্বলাল গুপ্ত, জাপানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক নেতা ডাক্তার সুমেই ওহকাওয়া প্রমুখ। লালা লাজপত রায়ের ভাষণে উপস্থিত জাপানি শ্রোতারা খুবই অভিভূত হন। এই সভার খবর জাপানে অবস্থিত ইংরেজ দূতাবাসে পৌঁছে যায়। স্বভাবতই ইংরেজ দূতাবাসের কর্তারা খুব ক্ষেপে যান। তাঁরা জাপান সরকারের

ফ ঃ ৬

পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করেন যাতে এইসব ভারতীয় বিপ্লবীদের অনতিবিলম্বে জাপান থেকে বিতাড়িত করা হয়। জাপান তখন ছিল ব্রিটিশ শক্তির আজ্ঞাবহ। সুতরাং ২৮ নভেম্বরই এঁদের নোটিশ দিয়ে জাপান সরকার জানিয়ে দিল যেন এঁরা ৫ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ২ ডিসেম্বরের মধ্যে জাপান ত্যাগ করে চলে যান। লালা লাজপত রায় পরদিনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন।

জাপানের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো এবং সচেতন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা জাপান সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা আরম্ভ করলেন। ইংরেজ সরকার কেন জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে জাপানের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার সাহস করবে? জাপানে কে থাকবেন বা থাকবেন না— সেটা কি ইংরেজ সরকার ঠিক করে দেবে? আর জাপান সরকারই-বা ইংরেজ সরকারের কাছে মাথা নীচু করে সবকিছু মেনে নেবে কেন? এইভাবে ওই কাজের জন্য নিপ্পনবাসীরা জাপান সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে লাগলো। হেরম্বলাল গুপ্ত ও রাসবিহারী কী করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁদের কাছে এই নির্দেশ মৃত্যু পরোয়ানা ছাড়া আর কিছু না। কারণ ২ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো নিরপেক্ষ দেশে যাওয়ার মতো কোনো জাহাজ ছাড়ার দিন ছিল না, সব জাহাজই যাবে হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর বা ভ্যাঙ্কুবার হয়ে যা সবই ব্রিটিশ নজরদারি এলাকার মধ্যেই। কাজেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই ষোলো আনা এবং ধরা পড়লে হয় ফাঁসি নয়তো যাবজ্জীবন কারাবাস।

রাসবিহারী ও হেরম্বলাল অধ্যাপক তোয়ামার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। অধ্যাপক তোয়ামা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিলেন এবং এই ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়কে বাঁচাবার জন গোপন পরিকল্পনা করছিলেন। এর মধ্যে ১ ডিসেম্বর জাপানের মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন যে এঁরা যদি ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে জাপান ত্যাগ না করেন তবে জাপান পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেবে। অধ্যাপক তোয়ামা ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা রাসবিহারী ও হেরম্বলালকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁরা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ি গেলেন। জনা দুয়েক জাপানি পুলিশ তাঁদের অনুসরণ করলেন। ওঁরা বাইরে চটিজুতো খুলে অধ্যাপক তোয়ামার বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পুলিশ দুজন তাঁদের চটিজুতোর উপর নজর রেখে গেটের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। অধ্যাপক তোয়ামা খুবই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন। জাপানে তাঁর অনেক অনুগামী ছিলেন। জাপানের রাজনৈতিক ও সরকারি মহলে অনেকেই তাঁকে খুব সমীহ করে চলতেন। পুলিশ তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকতে সাহস করে না। তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের জাপানে আত্মগোপন করে থাকার একটি ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। রাসবিহারী ও হেরম্বলাল ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। রাসবিহারী অধ্যাপক তোয়ামার একটি কিমোনো ও টুপি পরলেন, হেরম্বলাল পরলেন একটি ওভারকোট। তারপর অধ্যাপক তোয়ামার একজন বিশ্বস্ত অনুগামীর সঙ্গে বাড়ির রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে পাশের বাড়ির (যেটা ছিল অধ্যাপক তোয়ামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুগামী অধ্যাপক তেরাশুর বাড়ি) বাগানের মধ্য দিয়ে গিয়ে একটি সরু রাস্তা ধরে খানিকটা হেঁটে অন্য একটি বড়ো রাস্তায় উঠে পূর্বপরিকল্পনা মতো তাঁদের জন্য দাঁড় করানো একটি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়িটি তাঁদের নিয়ে শিনজুকুর একডিট বিখ্যাত বেকারি নাকামুরায়ার (Nakamuraya) সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওই বেকারির মালিক আইজু সোমা এবং তাঁর স্ত্রী কোকো সোমা অধ্যাপক তোয়ামার অনুগামী ছিলেন। তাঁরা এই ভারতীয় বিপ্লবী দুজনকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লুকিয়ে রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁরা বিপ্লবীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ বেকারির পিছনে একটি ছোট্ট কুঠুরিতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। এক জাপানি দম্পতির অন্তরে এশিয়াবাসী তথা ভারতীয়দের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি কতটা আন্তরিকতা ও দরদ থাকলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অচেনা অজানা ভিনদেশি দুই বিপ্লবীকে নিজেদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজেদের জীবনকে অনিশ্চিত কঠিনসংগ্রামের মধ্যে নিয়ে ফেলতে রাজি হয়েছিলেন। এটা ভাবতেই অবাক লাগে এবং শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে যায়। সব দেশেই সব সময়ই বোধ হয় এরকম কিছু মহৎ মানুষ জন্মান যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের মধ্যেই যেন নিজেদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান।

এদিকে জাপানি পুলিশ দুজন অনেক রাত পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের জুতোর উপর নজর রেখে দেখলেন কেউ তো বেরিয়ে এল না বরং অধ্যাপক তোয়ামার বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ হয়ে গেল। আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন বিপ্লবীরা পালিয়ে গেছেন। পরদিন থেকে জাপানি পুলিশ তৎপর হয়ে উঠলো; কিন্তু তাঁদের খুঁজে পাওয়া গেল না।

মিসেস কোকো সোমা অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মাতৃস্নেহে ওদের দেখাশোনা করতেন। তিনি অল্পসল্প ইংরেজি জানতেন, তিনি রাসবিহারীকে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর দিতেন। ওই ছোট্ট কুঠুরিতে আত্মগোপন করে থাকতে থাকতে হেরম্বলাল হাঁপিয়ে উঠলেন। অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝে জানালা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে উঠলেন এক জাপানি বন্ধুর বাড়ি। সোমা দম্পতি প্রমাদ গুনলেন। হেরম্বলাল ধরা পড়ে গেলে রাসবিহারীর আস্তানা পুলিশ জেনে গেলে সবাই বিপদে পড়ে যাবেন। তাঁরা দ্রুত অধ্যাপক তোয়ামাকে সব জানালেন। অধ্যাপক তোয়ামা খোঁজখবর লাগালেন। জানা গেল অধ্যাপক তোয়ামারাই পরিচিত ও অনুগামী ওহকাওয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন হেরম্বলাল। ওহকাওয়া অধ্যাপক তোয়ামাকে কথা দিলেন সবরকম বিপদ থেকে জীবন দিয়ে হলেও তিনি হেরম্বলালকে রক্ষা করবেন।

একাকিত্ব দূর করার জন্য এবং এই সময়টিকে ভালোভাবে কাজে লাগাবার জন্য রাসবিহারী জাপানি ভাষা লিখতে আরম্ভ করলেন। এ ব্যাপারে মিসেস কোকো সোমা তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। এই ভাবে চলছিল। এর মধ্যে মাস চারেক পরে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে এসে গেল। ঘটনা হলো, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে 'তেনো-মারু' (Tenyo-Maru) নামে একটি জাপানি জাহাজে গোলাবর্ষণ করে তাকে জোর করে হংকং বন্দরে নিয়ে আসা হয়; তারপর তা থেকে সাতজন ভারতীয়কে জোর করে নামিয়ে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বলা চলে, ইংরেজ নৌবাহিনী জোর করে জাপানি জাহাজে উঠে অস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁদের যাত্রীদের একেবারে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল যেন। জাতীয়তাবাদী জাপানি

নাগরিকদের স্বাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত করলো এই ঘটনা। ক্ষেপে উঠলো নিপ্পনবাসী। জাপানের সার্বভৌমত্বের উপর ইংরেজ সরকারের এই সরাসরি হস্তক্ষেপ নিপ্পনবাসীরা মেনে নিতে পারলেন না। ইংরেজ সরকারের এই আচরণে জাতীয়তাবাদী নিপ্পনবাসীরা গর্জে উঠলেন। দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এবার জাপান সরকারও চাপে পড়ে গেল এবং ইংরেজের সব হুকুম তাঁরা আর মানবেন না এটা জানিয়ে দেওয়া হলো। জাপানের বৈদেশিক দপ্তরের নিয়মনীতির উপরও নিপ্পনবাসীদের প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, ফলে জাপানের বৈদেশিক দপ্তর ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের উপর থেকে নির্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করে নিল। প্রায় সাড়ে চারমাস পরে প্রকাশ্যে আসতে পারলেন ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়। হেরম্বলাল আমেরিকায় চলে গেলেন। অধ্যাপক তোয়ামা রাসবিহারীর জন্য একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। জাপানের নাগরিকত্ব পেতে গেলে জাপানে অন্তত সাত বছর বসবাস করতে হবে।

জাপানে এতদিন যে সব ব্যাক্তি তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করে দিয়েছিলেন রাসবিহারী। এই ক' মাসেই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জোরে কাজ চালাবার মতো জাপানি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন তিনি। ওই ভোজসভায় তিনি জাপানি ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং নিজের রান্না করা কিছু ভারতীয় খাবার পরিবেশন করেন। উপস্থিত সকলে রাসবিহারীর এইরকম গুণের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তারপর থেকে রাসবিহারী টোকিয়োর বিভিন্ন জায়গায় জাপানি ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বহু জাপানি ওইসব বক্তৃতা শুনতে আসতেন। রাসবিহারী ওইসব বক্তৃতায় ভারতে ইংরেজদের শোষণের কথা, ভারতীয়দের মুক্তি সংগ্রামের কথা, ভারত-জাপান মৈত্রীর কথা শোনাতেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানিদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যেতে লাগল। শুধু ভারতবর্ষ নয়, অধ্যাপক তোয়ামার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্যান-এশিয়ান মুক্তি সংগ্রামের জন্যও কাজ করতে আরম্ভ করলেন। এশিয়ার অঞ্চলগুলো যেমন— থাইল্যান্ড, মালয়, বর্মা, জাভা, ফিলিপাইন, হংকং, চীন এসবই তখন পাশ্চাত্য দেশের কলোনি ছিল, তাই গোলামির শিকলে বাঁধা ছিল। এদের গোলামি থেকে মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। তাঁর সংগ্রামের পরিধি বাড়তে লাগলো।

জাপান সরকার রাসবিহারীরর উপর থেকে বহিষ্কারের পরোয়ানা তুলে নিলেও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কিন্তু জাপানে রাসবিহারীর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। ছুতোনাতা পেলেই জাপান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নেবে এরকম তালে ছিল। তাছাড়া তাঁকে গুপ্ত হত্যাও করা হতে পারে— এরকম সম্ভাবনাও ছিল। একজন বিদেশি জাপানের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করছেন, সব জায়গা যে তিনি ভালোভাবে চেনেন তা নয়, সবাই যে তাঁকে চেনে তাও নয়, এরকম অবস্থায় তিনি সহজেই চিহ্নিত হয়ে গুপ্তঘাতকের হাতে পড়ে যেতে পারেন। অধ্যাপক তোয়ামা এই সম্ভাবনার আঁচ করতে পেরে রাসবিহারীকে রক্ষাকবজ দেওয়ার একটি অভিনব পরিকল্পনা করলেন। তিনি তাঁর অনুগত সোমাদম্পতিকে প্রস্তাব দিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের মেয়ে তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিবাহ দেন। অচেনা অজানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতে গিয়ে যাতে শত্রুদের হাতে পড়ে না যান তার জন্য তোশিকো তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থেকে তাঁর রক্ষাকবজের কাজ করতে পারবে। তাছাড়া এতে ভবিষ্যতে জাপানি নাগরিকত্ব পেতেও সুবিধা হবে রাসবিহারীর পক্ষে।

শ্রীমতী কোকো সোমা পরবর্তী সময়ে একটি কাগজে (বাংলা অনুবাদক কাগজটির নাম দিয়েছেন— 'বিচিত্র জগৎ') এবিষয়ে লিখেছেন— 'রাসবিহারী আমাদের বাটী পরিত্যাগ করিবার পর দেখা গেল ব্রিটিশরাজদূতের গুপ্তচরের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। একমাত্র উপায় একজন সতর্ক পার্শ্বরক্ষী দিবারাত্র তাহার সহিত থাকিবে। প্রথমে ছদ্মবেশে আমার স্বামী তাহার সহিত থাকিতেন। কিন্তু বেশিদিন এরূপভাবে ছদ্মবেশে আমার স্বামী পারিবেন না আর তাহা সম্ভবও নহে।... ব্রিটিশ দূতাবাসের গুপ্তচর ও গুপ্ত ঘাতকের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর বটে, কিন্তু কী উপায়ে যে তাঁহাকে রক্ষা করা যায় আমরা এখনো তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা প্রায় দিশেহারা হইয়া পারিয়াছি। একদিন তোয়ামা আমার স্বামীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। আমরা এই প্রস্তাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।...' (কর্মবীর রাসবিহারী-অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু পৃষ্ঠা-১০১)

ভিন্ন দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি যুবকের হাতে নিজের মেয়ের ভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়ার এই প্রস্তাবে সোমা দম্পতি প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই। তবে উচ্চ আদর্শের অনুসারী সামুরাই বংশজাত সোমা দম্পতি মানব কল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। তাঁদের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকার সময় এই ভারতীয় যুবকের আচার ব্যবহার, নম্রতা, ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা এবং মেধা তাঁদের মুগ্ধ করেছে। মিসেস সোমাকে রাসবিহারী সবসময় মা বলে সম্বোধন করতেন। তিনিও তাঁকে পুত্রস্নেহেই দেখতেন। রাসবিহারীর সততা সম্পর্কে তাঁদের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। তাঁরা এই বিবাহের সম্মতি দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা হলো কন্যা তোশিকোকে নিয়ে। তাঁর মতামত জানতে চাইলে কিছুদিন সময় চেয়ে নিলেন তিনি ভাবার জন্য।

তোশিকো ছিলেন পিতা-মাতার আদর্শ সন্তান। ভিন দেশি একটি যুবক যার সভ্যতা সংস্কৃতি আলাদা তাঁকে বিয়ে করে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সুখী হবেন কিনা তা নিয়ে ভাবলেন না; বরং এই যুবক নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কঠিন লড়াইয়ের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিজের দেশ ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অচেনা অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছেন, এতে তিনি খুব অনুপ্রাণিত বোধ করতেন। হন না কেন তিনি বিদেশি তাঁর এই মহান সংগ্রামে তিনি যদি সঙ্গ দিতে পারেন তবে সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম পালন; তাছাড়া মানুষটিকে তিনি যতটা দেখেছেন বা বুঝেছেন তাতে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেই মনে হয়েছে তাঁর। মনকে প্রস্তুত করলেন তিনি। মাস খানেক পর তাঁর মা পুনরায় তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন— 'মা। রাসবিহারীর হাতেই আমাকে দান কর। আমি তাঁর জীবন্ত বর্ম হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি।' (কর্মবীর রাসবিহারী— অধ্যাপক বিজনবিহারী

বসু পৃষ্ঠা-১০২)। সোমা পরিবারের জানার বিষয় ছিল— রাসবিহারীর এই বিয়েতে মত আছে কিনা, তাছাড়া ভারতে সে বিয়ে করেছে কিনা। এই বিবাহ নিয়ে রাসবিহারীর মধ্যে প্রথমে একটা দ্বিধার ভাব থাকলেও অধ্যাপক তোয়ামা যখন ভালো-মন্দ সমস্ত চিন্তা করে এই প্রস্তাব দিয়েছেন তখন সেটা তাঁর কাছে আদেশেরই নামান্তর। তাই তিনিও মত দিলেন এবং জানালেন ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এবং সেই সংগ্রামে এতটাই গভীর ভাবে জড়িয়ে আছেন যে এতদিন বিয়ের কথা ভাবেননি।

অবশেষে ১৯১৮ সালের ৯ জুলাই অধ্যাপক তোয়ামার বাসগৃহে ৩২ বছরের রাসবিহারী ও ২২ বছর বয়সি জাপানি কন্যা তোশিকোর বিবাহ হয়ে গেল। তোশিকো ভারতীয় সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতোই স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন এবং বিপ্লবী স্বামীর সমস্ত কাজেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং রক্ষাকবজের মতো তাঁকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য সদাসচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বিবাহিত জীবনও কিন্তু গুপ্তবাসেই কাটাতে হয়েছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রায় সতেরোবার তাঁদের বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এই গুপ্ত আবাসে থাকাকালীন ১৯১৯ সালে তাঁদের এক পুত্রসন্তান হয়, নাম মাসাহিদে। ১৯২২ সালে হয় এক কন্যাসন্তান নাম তেতুকো। সাত বছর জাপানে থাকার পর অবশেষে ১৯২৩ সালে অধ্যাপক তোয়ামার প্রচেষ্টায় রাসবিহারী বসু জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। রাসবিহারী ও তোশিকো তাঁদের নিজেদের একটি ছোটো বাড়িতে স্বস্তিতে থাকতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাসবিহারীর দাম্পত্য সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং গুপ্ত ঘাতকদের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য দুটি সন্তান-সহ বিভিন্ন গুপ্ত আবাস পরিবর্তন করে করে খুব সন্তর্পণে জীবনযাপন ও চলাফেরা করতে গিয়ে যে অসম্ভব দৈহিক ও মানসিক চাপ তাঁকে নিতে হয়েছিল তাতে তোশিকোর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ রাসবিহারীর প্রিয় পত্নী মহীয়সী নারী তোশিকো নিউমোনিয়া অসুখে পরলোকগমন করেন। নিজের প্রিয় পুত্রকে পরবর্তীকালে রাসবিহারী নিজের তৈরি 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র একজন ক্যাপ্টেনরূপে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র সেই যুদ্ধে প্রাণদান করেছিলেন। সে অন্য ইতিহাস।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে মহান বিপ্লবী রাসবিহারীর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি খুবই ভালো রান্না করতে পারতেন। ১৯২০ সাল নাগাদ সোমা দম্পতিদের নাকামুরায়া বেকারির ব্যবসায় লোকসান হতে আরম্ভ করল। তখন হাল ধরার জন্য এগিয়ে আসেন রাসবিহারী। তিনি বেকারির একটি অংশে চালু করেন একটি রেস্টুরেন্ট। সেখানে তিনি নিজের হাতে রান্না করা নানারকম ভারতীয় খাবার রাখতে আরম্ভ করেন যা জাপানিদের খুবই আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমে সেই রেস্টুরেন্টের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল; তিনিও সেখানে 'বোস অব নাকামুরায়া' নামে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন (Revolutionaries-by Sanjeev Sanyal, P-159)। এতটাই বিখ্যাত হয়েছিল সেই রেস্টুরেন্ট যে সেটি আজও সেখানে আছে এবং তাঁর রেসিপির খাবার এখনো পাওয়া যায়। এখন জাপানে গেলে ভারতীয় খাবার খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তথা 'বোস অব নাকামুরায়া'র হাত ধরেই ভারতীয় রেসিপি জাপানে জনপ্রিয় হয়েছে।

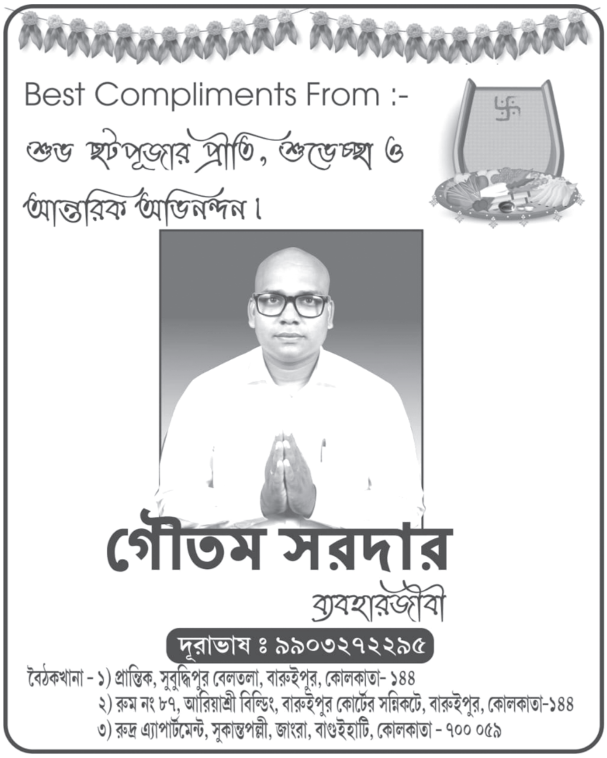

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

কনক চৌধুরী

‘দ্য আরএসএস : এ ভিউ টু ইনসাইড’, বইটিতে ওয়াল্টার কে অ্যান্ডারসন লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক লাভালাভের বিষয়ে চিন্তা না করে রাষ্ট্রনির্মাণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার লক্ষ্য রাখে।’ এই অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা জাতির সামগ্রিক বিকাশে ভারতের সামাজিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট গঠনকারী একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সর্বজনবিদিত যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন জীবনব্রতী কার্যকর্তাকে ‘প্রচারক’ বলা হয়। তাদের জীবন ব্রহ্মচর্য, অটল নিষ্ঠা এবং গভীর অঙ্গীকার দিয়ে আলোকিত। সঙ্ঘের প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সঙ্ঘের তিনটি প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পন্ন করতে হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যখন তার রাষ্ট্রসেবার শততম বছর পূর্ণ করছে, তখন সঙ্ঘ কীভাবে এই অধ্যায়কে উদ্‌যাপন করছে তা নিয়ে জনমানসে একটি কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সঙ্ঘের কাছে এটা নিশ্চিত যে এই ধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য নয়, বরং তাদের আত্মবিশ্লেষণ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আরও গভীরভাবে নিবেদিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটি সেইসব অদম্য ব্যক্তিত্বদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ারও একটি সুযোগ যাঁরা এই সংগঠনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বয়ংসেবক ও তাঁদের পরিবারের সদস্য যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে এই যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন— তাঁদেরও শ্রদ্ধা জানানোর মুহূর্ত এটি। এই শুভক্ষণটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মবার্ষিকীর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, যা হিন্দু পঞ্জিকার প্রথম দিন, যা বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য উচ্চকিত; এক ঐক্যবদ্ধ ও বিকশিত ভারত নির্মাণকল্পে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সঙ্ঘের শত বছরের যাত্রার স্মৃতি রোমন্থনে যা সহায়ক। স্বয়ংসেবকদের স্বপ্ন ভবিষ্যতে এক পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রনির্মাণ। সঙ্ঘের ১০০ বছরের যাত্রায় তাঁরা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেবা, শিক্ষা, সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও অটল অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই সংগঠন জাতীয় পরিচয় এবং জাতির চেতনার বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সঙ্ঘের সামাজিক উদ্যোগগুলি তার মূল নীতি ‘নিঃস্বার্থ সেবা’কেই সবার সামনে তুলে ধরে। দেশজুড়ে বিস্তৃত হাজার হাজার শাখার সুবিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রকল্পের জন্য সমাজকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছে। প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন থেকে শুরু করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-সহ তৃণমূল পর্যায়ের এইসব প্রচেষ্টা লক্ষ লক্ষ জীবনকে স্পর্শ করেছে। যে কোনো সংকটের সময় স্বয়ংসেবকরা ধারাবাহিকভাবে উদ্ধারকার্য, খাদ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন এবং হাতেকলমে সহায়তা করেছেন। জরুরি ত্রাণের বাইরেও সঙ্ঘ সমাজকে উন্নীত করার জন্য স্থায়ী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবেশ সংরক্ষণ অভিযান এবং সাংস্কৃতিক উৎসবের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা জাতির বন্ধনকে শক্তিশালী করে দেশের গরিমা বৃদ্ধি করে চলেছে। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত বলেছেন, ‘মানবতার সেবাই ঈশ্বরের সেবা।’ এই নীতি সঙ্ঘের সমাজ-প্রেমকে শক্তিশালী করে, নিশ্চিত করে যে এই কাজ শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে ভারতের যে কোনো প্রান্তিক মানুষের সেবা করে তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। ডাঃ হেডগেওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন যে দৈনন্দিন জীবনে দেশপ্রেমের অভাব, জাতীয় চরিত্রের অবনতির ফলে সমাজ জীবনে সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ জীবনে শৃঙ্খলার অভাবের কারণে বহিরাগত আক্রমণকারীরা ভারতে পা রাখাতে পেরেছে। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে অবিরাম আগ্রাসনের কারণে দেশবাসী ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের সামগ্রিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে।

সেই কারণে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে হতাশা ও হীনম্মন্যতার অনুভূতি তৈরি হয়েছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মাত্র কয়েকজন নেতার অধীনে রাজনৈতিক সক্রিয়তা আমাদের প্রাচীন দেশের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে না। তাই, তিনি জাতির স্বাভিমান নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার একটি পদ্ধতি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিত্য শাখা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সঙ্ঘের উদ্ভাবনী এবং অনন্য কার্যকারিতা রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনার ফসল। ভুলে গেলে চলবে না যে ভারত একটি প্রাচীন সভ্যতা যার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্বমানবতার স্বার্থে

তাকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়। সেজন্য ভারতের সাধারণ জনগণকে সেই লক্ষ্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্ঘের বিদ্যা ভারতী একটি অসাধারণ নাম, যা ভারতের অন্যতম বৃহৎ স্কুল-নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে চলেছে এমন হাজারো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাপনা কেবল শিক্ষাগত উৎকর্ষতাই নয়, দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক স্বাভিমান এবং আত্ম-শৃঙ্খলার মতো মূল্যবোধ বিকাশের উপরও জোর দেয়।

পাঠ্যক্রমটি প্রায়শই ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের পাঠগুলিকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক এবং তাদের ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত প্রকৃত নাগরিক তৈরি করা। প্রচলিত শিক্ষার বাইরে সঙ্ঘ বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়, জ্ঞানের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের পথকে প্রসারিত করে। ঐতিহ্যবাহী আদর্শের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার মিশ্রণের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সংকট মোকাবিলা করার জন্য একটি পরম্পরা গড়ে তুলতে অবদান রাখে। সঙ্ঘ প্রকাশ্যে অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করে, হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলে। সঙ্ঘকার্যকর্তারা জোর দিয়েছেন যে জাতীয় অগ্রগতির জন্য সংগঠিত থাকতেই হবে এবং অস্পৃশ্যতা মোকাবিলায় তাদের পদক্ষেপ কামনা করে ভারতীয় সমাজ। সমস্ত ভেদাভেদ উর্ধ্বে ওঠার জন্য সঙ্ঘ নানান কার্যক্রমের আয়োজন করে।

এটি বস্তি এবং গ্রামীণ এলাকায় দলিতদের মতো প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলিকে তার কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। সর্বোপরি, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনার জন্য স্বয়ংসেবকরা শ্রম, কৃষি, ছাত্রকল্যাণ, শিক্ষা, ধর্মীয় নেতৃত্ব, রাজনীতি, শিল্পকলা, আইন, ক্ষুদ্র শিল্প, উপজাতি কল্যাণ, খেলাধুলা এবং আরও অনেক কিছু-সহ সর্বভারতীয় স্তরে ৩৬টিরও বেশি ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন। এই উদ্যোগগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কার্যক্রম, যেখানে স্বয়ংসেবকরা কর্মরত আছেন, স্বাধীনভাবে এবং স্বায়ত্তশাসিতভাবে পরিচালিত হয়, যা বহিরাগত শক্তি কাঠামোর উপর নির্ভর না করে সমাজকে ভেতর থেকে সংগঠিত করা হয়।

ড. বি আর আম্বেদকর ১৯৪০ সালে মহারাষ্ট্রের সাতারায় একটি 'শাখা' পরিদর্শন করেছিলেন। পুনের একটি মারাঠি দৈনিক কেশরী ১৯৪০ সালের ৯ জানুয়ারি ড. বি আর আম্বেদকরের সঙ্ঘের শাখায় যাওয়ার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। লেখাটিতে সঙ্ঘের চিন্তাবিদ দত্তোপন্ত ঠেংড়িজীর লেখা 'ড. আম্বেদকর ঔর সামাজিক ক্রান্তি কি যাত্রা' বইটিতেও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে ড. আম্বেদকর এবং দলীয় রাজনীতির মধ্যে ভেদাভেদ মুছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বয়ংসেবকরা মনে করেন যে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি জাতির নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে। জাতির পরিচয় ও উদ্দেশ্যের সম্মিলিত বোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে, সঙ্ঘ নিশ্চিত করে যে সাংস্কৃতিকভাবে প্রোথিত একটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে, এমনকী যখন এটি একটি বৈচিত্র্যময় গণতান্ত্রিক জটিলতার মধ্য দিয়েও এগিয়ে যায়। আজ সঙ্ঘের ১০০ বছরে দাঁড়িয়ে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতকে যদি সার্বজনীন সম্প্রীতি ও একতার ধারণার উপর ভিত্তি করে ভূমিকা পালন করতে হয়, তাহলে ভারতের সাধারণ জনগণকে সেই লক্ষ্যের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। সঙ্ঘ শতবর্ষ ধরে সেই কাজই করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের একটি হিন্দি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কেবল সত্তা সে মত করো পরিবর্তন কি আস, জাগ্রত জনতা কে কেন্দ্র সে হোগা হামারা সমাজ'। অর্থাৎ, 'পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করা নয়; একটি জাগ্রত জনগণের কেন্দ্র থেকে একটি সফল সমাজের উদ্ভব হয়।' ২০২৫ সালের বিজয়াদশমীর দিন সঙ্ঘ তার যাত্রা এবং লক্ষ্যের ১০০ বছর পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজের প্রসার ত্বরান্বিত করার জন্য আরও বেশি লোককে রাষ্ট্রসেবার এই যজ্ঞে সংযুক্ত করে জাতি গঠনের লক্ষ্যে আরও বেশি কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। এই মাইলফলক অনুসরণ করে স্বয়ংসেবকরা 'পঞ্চ পরিবর্তন' নামে পরিচিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সমাজের আরও বেশি অংশকে যুক্ত করে সমাজ পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন— (১) ব্যক্তিজীবনে 'স্ব'-এর অভিব্যক্তি, (২) পরিবার প্রবোধন, (৩) সামাজিক সমরসতা, (৪) নাগরিক শিষ্টাচার এবং (৫) পরিবেশ সংরক্ষণ।

সঙ্ঘের দূরগামী লক্ষ্য হলো, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত নির্মাণ এবং তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সামগ্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা। শতবর্ষব্যাপী যাত্রায় সঙ্ঘ আজ বৈশ্বিক পথপ্রদর্শক এবং বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আলোকবর্তিকার মতো উদ্ভাসিত।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

যখন উত্তরবঙ্গ ডুবছিল, তখন কলকাতায় কার্নিভালের নাচ চলছিল

বিপ্লব বিকাশ

উত্তরবঙ্গের আকাশ সেই দিন ছিল কালো মেঘে ঢাকা। নদীগুলো ফুলে উঠেছিল, ঘরবাড়ি ভেসে যাচ্ছিল, মানুষ বাঁচার লড়াইয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। বনভূমি থেকে ভেসে আসছিল কাঠ, অবৈধভাবে কাটা সেই কাঠ যেন নিজেই দিচ্ছিল জঙ্গল কাটাই ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ। অসহায় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ বন্যপ্রাণীরাও বন্যার জল থেকে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই লড়ছিল। আমরা দেখলাম কীভাবে বন্যপ্রাণীদের মৃতদেহ পড়ে ছিল। আর ঠিক তখনই রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় চলছিল অন্য এক উৎসব, টলিউড তারকাদের সঙ্গে নাচে গানে মাতোয়ারা ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী!

ইতিহাসে পড়েছিলাম, 'যখন রোম জ্বলছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিল।' কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গবাসী যেন সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখল, যখন উত্তরবঙ্গ ভাসছে, মুখ্যমন্ত্রী তখন কার্নিভালের আনন্দে ব্যস্ত। দুর্যোগ, মৃত্যু, আর্তনাদ, সব কিছু যেন তাঁর থেকে বহু দূরের কোনো গল্প। আগে কার্নিভাল হবে, তারপরে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের অবস্থা। এর কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতা বর্ষার জলে ভেসে গিয়েছিল। মূল্য দিয়েছিল সেই পরিবারগুলি যাদের বাড়ির লোকজন প্রাণ হারায়। আর আমরা? আমরা ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ নিয়ে চুপ ছিলাম নয়তো ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছিলাম। হ্যাঁ, কয়েকজন অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনা করতে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এটা কি সমাধান? না, একদমই নয়। যদি এটা সমাধান হতো তাহলে উত্তরবঙ্গ জলে এই ভাবে ভাসতো না। সরকার প্রস্তুতি নিতো। একবার ভেবে দেখুন তো সরকারের প্রস্তুতির অবস্থা। ইতিহাস একদিন নিশ্চয়ই লিখবে, 'যখন মানুষ কাঁদছিল, তখন কলকাতায় নেতারা নাচছিলেন।'

কিন্তু এটাই কি সবচেয়ে দুঃখজনক দৃশ্য? না। আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটল সেই বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই, যেখানে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। দু'জনেই আহত হলেন, পাথর নিক্ষেপ করে হামলা হলো তাঁদের ওপর। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী তাঁদের উপর পাথর বৃষ্টি চালিয়েছে। প্রশ্ন জাগে, মানুষকে সাহায্য করতে যাওয়া জনপ্রতিনিধিরা যদি নিরাপদ না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? আসলে মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে এই প্রশ্ন করা একটি পরম্পরা তো বটেই, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এর কোনো অর্থ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা এখন এক নতুন স্বাভাবিকতা। নির্বাচন হোক বা না হোক, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণ, ভয় দেখানো, এমনকী প্রাণনাশের চেষ্টা বা ব্যক্তিহত্যা, সবই এখন খবরের রুটিনের অংশ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যখন দলীয় কর্মীদের 'ফোঁস করে ওঠার' আহ্বান দেন, তখন কি এটাই তার বাস্তব রূপ নয়?

অন্যদিকে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভয় পাচ্ছে সবাই। দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া এক তরুণীর সম্ভ্রমহানি করা হলো, আর মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'রাতে মেয়েটির বেরোনো উচিত ছিল না।' এ কোন মানসিকতা? একজন নারীকে দোষারোপ করে কী প্রশাসনের দায় শেষ হয়? সমাজের বিবেক কোথায়? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ল' কলেজ হোক বা দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ— মেয়েদের ওপর এই ধরনের যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটানো দুষ্কৃতীরা সবাই তৃণমূল পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এতো সাহস কথা থেকে পাচ্ছে দুষ্কৃতীরা? মনে রাখবেন ফোঁস করছে নিজের-নিজের মতো করে এরা। এই ফোঁস করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছিলেন। এই সরকারটাকে দুষ্কৃতীরা তাদের নিজেদের সরকার বলে মনে করছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, যেখানে গত বছর রাত দখল নিয়ে রাস্তায় নামত বিভিন্ন সংগঠন, আজ সেখানে নীরবতা। কোনো ফেমিনিস্ট আন্দোলন নেই, কোনো প্রতিবাদ মিছিল নেই। কেন? গত বছর আর জি কর আন্দোলনের পর যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়েছিল বাম ও তৃণমূলের মধ্যে, তা আজ ফল দিচ্ছে— চুপ থাকা, সুবিধা পাওয়া আর জনরোষকে ম্যানেজ করার মাধ্যমে।

এই নীরবতা ভয়ংকর! একদিকে হিংসা, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, দুর্নীতি, অন্যদিকে শাসক দলের আত্মতৃপ্তি, তারকা-ঝলমলে উৎসব, আর প্রশাসনের প্রতি জনগণের অবিশ্বাস। রাজনীতির এই চিত্র এক ভয়ানক অসুস্থ শাসনের প্রতিচ্ছবি। আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন, এই রাজ্য কবে মুক্তি পাবে এই হিংসা, সন্ত্রাস, অপশাসন ও অন্যায়ের প্রতি উদাসীনতার রাজনীতি থেকে? গত পাঁচ দশক ধরে এই রাজ্যের মানুষ ভুগছে রাজনৈতিক হিংসার আগুনে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩৯)

প্রথম দিনগুলির কথা ও নামকরণ

সঙ্ঘের শুরুতে কোনো কার্যক্রম পদ্ধতি বা কোনো নিয়ম রীতি কিছুই ছিল না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রম বলতে বিভিন্ন ব্যায়ামশালায় শরীর চর্চা ছিল প্রধান। নাগপুরে এমনিতেই অনেক শরীরচর্চার আখড়া ছিল। পরবর্তীতে ডাক্তারজীর প্রয়াসে রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলের আর্থিক আনুকূল্যে নিজস্ব দুটি আখড়া তৈরি করা হয়েছিল। 'মহারাষ্ট্র ব্যায়ামশালা' ও 'প্রতাপ আখড়া'। তখন রবিবার সকাল ৫টায় সকলকে 'ইতওয়ার দরওয়াজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' সমবেত করা হতো। মার্তণ্ডরাও জোগের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল সামরিক প্রশিক্ষণ (কুচকাওয়াজ জাতীয়)। প্রথম দিকে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার চলতো 'রাজনৈতিক বর্গ' (তখন এই শব্দটির ব্যবহার হতো)। এর উদ্দেশ্য ছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সামনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় কর্তব্য বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করা। এই রাজনৈতিক বর্গ আসলে বর্তমানের 'বৌদ্ধিক বর্গ'— যা ১৯২৭ সালের পর থেকে প্রচলিত হয়।

তখনকার দিনে রামটেকের রামনবমীর মেলা ছিল বিখ্যাত। প্রচুর লোক সমাগম হতো সেখানে। ডাক্তারজী ঠিক করলেন ১৯২৬-এর এপ্রিল মাসের রামনবমী মেলায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেকদের নিয়ে যাবেন। উদ্দেশ্য সঙ্ঘের শৃঙ্খলাপরায়ণ তরুণ দল দ্বারা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা, পূজাস্থল দর্শনে অনুশাসনবদ্ধ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা। প্রশাসনের কিছু পুলিশ থাকলেও তারা সব সামলাতে পারত না। স্বয়ংসেবকরা এই কাজে যুক্ত হলে তাদের যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়বে তেমনি সাধারণ মানুষের মনে স্বয়ংসেবকদের সম্পর্কে একটা মর্যাদার আসনও তৈরি হবে। কিন্তু ডাক্তারজী দেখলেন সঙ্ঘের তো কোনো নামই নেই এখন পর্যন্ত। সঙ্ঘকে সকলের সামনে তুলে ধরতে গেলে প্রথমতো একটা নাম দরকার আর বিশেষ ভাবে পরিচিত হতে দরকার তার নির্দিষ্ট পোশাক। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ১৭ এপ্রিল ডাক্তারজী বিশেষ কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক ডাকলেন, সেখানে ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবের জন্য তিনটি নাম সভায় উপস্থাপন করা হয়। (১) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, (২) জরি পটকা মণ্ডল, (৩) ভারতোদ্ধারক মণ্ডল। অনেক যুক্তি তর্কের পরে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামটি গৃহীত হয় বৈঠকে।

'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব' এই দীক্ষা দেওয়ার জন্য ডাক্তারজী সঙ্ঘের স্থাপনা করেছিলেন। সমস্ত অরাজকতার মূল কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতি ও অসঙ্ঘবদ্ধতা। পোশাক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডাঃ পরাঞ্জপে ও ডাক্তারজীর নেতৃত্বে তৈরি 'ভারত সেবক সমাজ'-এর স্বেচ্ছাসেবকদের পোশাককেই অনুসরণ করে সঙ্ঘ স্বয়ংসেবকদের জন্য নির্দিষ্ট হলো। খাকি হাফ প্যান্ট, খাকি শার্ট ও দুটি বোতাম যুক্ত খাকি টুপি। এই ছিল স্বয়ংসেবকদের প্রথম দিককার গণবেশ।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস